বাংলাবুক.অর্গ

আমার পড়া লেখা

ভি এস নাইপল

অনুবাদ

মূর্তালা রামাত ও শারমিন শিমুল

'আমার বয়স তখন মাত্র এগারো, তার বেশি নয়। ওইটুকু বয়সেই লেখক হবার বাসনা আমাকে পেয়ে বসল আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই ইচ্ছেটা আমার লক্ষ্যে পরিণত হলো।' কিন্তু বালক বয়সের ভি. এস. নাইপলের জন্য লেখক হবার ইচ্ছা আর সে ইচ্ছা পূরণের মাঝে বিস্তর ফারাক ছিল। লেখক হবার জন্য তাঁকে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতিকে বোঝার উপায় খুঁজে বরে করতে হয়েছে। এই তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতির উৎস হলো নাইপলের পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিতে রয়ে যাওয়া আধা বিস্মৃত জন্মভূমি ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ঔপনিবেশিক সমাজ যেখানে নাইপল বেড়ে উঠেছে, আর ইংরেজি উপন্যাসের মাধ্যমে পরিচিত সম্পূর্ণ ভিন দেশি জগৎ।

সাহিত্য নির্ভর আত্মজীবনীর এই রচনায় ভি. এস. নাইপল ত্রিনিদাদে কাটানো তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি, ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন আর তাঁর লেখালেখির একেবারের প্রথম দিকের প্রচেষ্টার স্মৃতিগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে নিরীক্ষণ করে উপস্থাপন করেছেন। এই নিরীক্ষাধর্মী লেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর জীবন ও লেখালেখি কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রচেষ্টা যা ছিল তাঁর কল্পনা জগৎ এবং লেখক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনের মূল চালিকা শক্তি । যুগে যুগে বিভিন্ন বিজেতার হাতে নিগৃহীত ভারতের রুগ্ন পরিস্থিতি, পরাজয় আর ধ্বংসের যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি যা কিনা দেশ ও দেশের মানুষকে গদ্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে সেদিকেই তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত অথবা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্য ধারার মাঝে যে সম্পর্ক তা নিয়ে নাইপলের প্রগাঢ় অভিব্যক্তির বহির্প্রকাশ ঘটেছে এই রচনায়। আর এর মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে যে তিনি কীভাবে নিজের লেখক কণ্ঠ আর লেখালেখির বিষয়বস্তু আবিষ্কার করেছেন, কীভাবে তিনি কখনো কথাসাহিত্য আবার কখনো বা ভ্রমণকাহিনির মাধ্যমে নিজের কণ্ঠ আর বিষয়বস্তুকে সততার সাথে উপস্থাপন করেছেন। নিজের রচনার সাথে সাথে তিনি সাহিত্যের একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ, ঊনবিংশ শতকের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় উপন্যাসের অত্যাশ্চর্য উন্নয়ন এবং বিংশ শতকে উপন্যাসের ক্ষমতার বিবর্তনের সুনির্দিষ্ট চিত্র এঁকেছেন। সেইসাথে উপন্যাসের চলচ্চিত্রমুখী হবার দিকেও তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

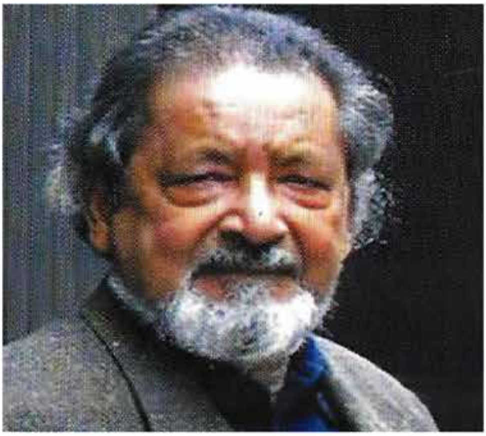

বিদ্যাধর সুরাজপ্রসাদ নাইপল (ভি.এস. নাইপল) ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ত্রিনিদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বৃত্তি অর্জনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে অভিবাসন নেন। ব্রিটিশ-ত্রিনিদাদিয়ান এই লেখক মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশিকতাবাদের উত্তরাধিকার নিয়ে উপন্যাস লেখার জন্য বিখ্যাত। তাঁর অসংখ্য উপন্যাসের ভেতর রয়েছে *আ হাউজ ফর মিস্টার বিশ্বাস, আ বেন্ড ইন দ্য রিভার* এবং বুকার পুরস্কার বিজয়ী *ইন আ ফ্রি স্টেট এর* মতো পাঠক নন্দিত বিশ্ববিখ্যাত বই। ভ্রমণ কাহিনিমূলক আরও কিছু নন ফিকশন তিনি লিখেছেন যার ভেতরে উল্লেখযোগ্য হলো- *ইন্ডিয়া: আ মিলিয়ন মিউটিনিস নাউ, বিওন্ড বিলিফ: ইসলামিক এক্সকারশনস এমং দ্য কনভারটেড পিপলস।* ১৯৭১ সালে বুকার পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯৯০ সালে তিনি নাইট উপাধি পান এবং ১৯৯৩ সালে ব্রিটিশ সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় ডেভিড কোহেন পুরস্কার। এরপর ২০০১ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০৮ সালে *দ্য টাইমস* প্রকাশিত '১৯৪৫ সালের পর শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশজন ব্রিটিশ লেখক' এর তালিকায় তার স্থান সপ্তম।

মূর্তালা রামাত ১৯৮৩ সালের ৩১ আগস্ট বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলার সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে বাস করছেন অস্ট্রেলিয়ায়। তার প্রকাশিত দুটি বই- কস্টালজিয়া (২০০৮) এবং অনুবাদ কবিতা (২০০৯)।

শারমিন শিমুল ১৯৮৩ সালের ১ নভেম্বর বাংলাদেশের যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যয়নরত।

আমার পড়া লেখা

ভি.এস. নাইপল

অনুবাদ

মূর্তালা রামাত

শারমিন শিমুল

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঐতিহ্য

আমার পড়া লেখা

মূল: ভি.এস. নাইপল

অনুবাদ: মূর্তালা রামাত ও শারমিন শিমুল

প্রকাশক

ঐতিহ্য

রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড

বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল

ফাল্গুন ১৪১৮

ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ

মুদ্রণ

ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য

একশত টাকা

AMAR PORA LEKHA by V.S. Naipul
Translated by Murtala Ramat & Sharmin Shimul.
Published by Oitijjhya.
Date of Publication February 2012.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright@2012 V.S. Naipul
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form.

Price: Taka 100.00 US$ 2.00
ISBN 978-984-776-060-5

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদ প্রসঙ্গে

ভি.এস. নাইপলের লেখার সাথে পরিচয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতোকোত্তর করার সময় তাঁর *আ বেন্ড ইন দা রিভার* নামের উপন্যাসটি আমাদের পড়তে হয়েছিল। অসাধারণ একটি রচনা। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী এই লেখকের কাহিনি, শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন থেকে শুরু করে গল্প বলার ভঙ্গি এবং লেখার দর্শন পুরোটাই তাঁর স্বতন্ত্র লেখকসত্ত্বার পরিচয় দেয়। নোবেল কমিটির মতে, "Naipaul is a modern philosophe carrying on the tradition that started originally with Lettres persanes and Candide. In a vigilant style, which has been deservedly admired, he transforms rage into precision and allows events to speak with their own inherent irony."

আমার পড়া লেখা (রিডিং অ্যান্ড রাইটং আ পারসোনাল অ্যাকাউন্ট) বইটিতে তিনি মূলত তাঁর লেখক হয়ে ওঠার কাহিনি আমাদের বলেছেন। সেই কাহিনি বলতে গিয়ে ঔপনিবেশিক কাঠামোর কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে ভারতবর্ষের দুর্দশার কথা, এসেছে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা এবং চলচ্চিত্রের কথা। এই বইয়ের মাধ্যমে নাইপল আমাদের সামনে তাঁর একান্ত লুকানো যে জগৎ তুলে ধরেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তা আমাদের সাহিত্য চিন্তাকে নাড়া দিয়েছে, সাহিত্য নিয়ে আমাদের উপলব্ধিকে আরও শানিত করেছে। অন্য সবার সাথে সেই উপলব্ধিটুকু ভাগাভাগি করার মানসেই বইটির অনুবাদ কাজে হাত দেওয়া।

নাইপলের মতো উঁচু মাপের একজন লেখকের বই অনুবাদ করতে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনুবাদ মাত্রই মূল রচনা থেকে ভিন্নতর কিছু হয়ে দাঁড়ায় বলে অনেকে মনে করেন, সেটি মাথায় রেখেই আমরা *আমার পড়া লেখা* তে নাইপলের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে অক্ষুণ্ন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এ কাজে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। পরিশেষে অনুবাদ কর্মটি আস্থায় নিয়ে বই আকারে প্রকাশের জন্য প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্যকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

মূর্তালা রামাত
murtala31@gmail.com

শারমিন শিমুল
sharmin.shimul@gmail.com

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচি

পড়া লেখা/০৯
লেখক এবং ভারত/৩৩

পড়া লেখা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(BANGLABOOK.ORG)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১

'*স্মৃতি বলতে আমার কিছুই নেই*। নিজের মনের বড় দোষ ত্রুটিগুলোর মধ্যে এই স্মৃতিহীনতা একটি দোষ : যা কিছু আমাকে আকর্ষণ করে তা নিয়েই আমি ভাবতে থাকি, মনের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আগ্রহ কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুবাদে একসময় ঐ বিষয়ে নতুন কিছু খুঁজে পাই আর তাতেই *পুরো বিষয়টির প্রতি আমার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়*। আমার পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের কাচকে আমি যতভাবে সম্ভব ততভাবেই তাক করে মেলে ধরি অথবা গুটিয়ে নেই।'

--- স্টেনঢাল

দ্য লাইফ অব হেনরি বুল্যান্ড

আমার বয়স তখন মাত্র এগারো, তার বেশি নয়। ওইটুকু বয়সেই লেখক হবার বাসনা আমাকে পেয়ে বসল আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই ইচ্ছেটা আমার লক্ষ্যে পরিণত হলো। এত অল্প বয়সে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করার বিষয়টি হরহামেশা চোখে না পড়লেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। বই ও ছবি সংগ্রাহকদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন খুব অল্প বয়স থেকেই কাজ শুরু করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালের একজন স্বনামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আমার ক্ষেত্রে অবশ্য খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বদের মতো কিছু ঘটেনি। ছেলেবেলার লেখক হবার ইচ্ছাটা আমার জন্য অনেক বছর ধরে কেবল স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল। নতুন ঝরনা কলম, ওয়াটারম্যান কালি আর রুল টানা লেখার খাতা পেতে আমার ভালোই লাগত। কিন্তু ওসব লেখার সরঞ্জাম তেমন একটা ব্যবহার করা হয়ে উঠত না। কারণ লেখার ইচ্ছা বা প্রয়োজন কোনোটাই তখন আমার মধ্যে তেমন জোরালো ছিল না। আমি কিছুই লিখতাম না, এমনকি চিঠিও নয়। কারণ চিঠি লেখার মতো কোনো পরিচিত মানুষও ছিল না। স্কুলের ইংরেজি রচনা বিষয়ে আমার তেমন কোনো পারদর্শিতার কথা মনে পড়ে না; বাড়ির লোকের

BanglaBook.org

কাছে আমি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতেও পারতাম না। তাছাড়া, নতুন বইয়ের প্রতি লোভ থাকলেও পাঠক হিসেবে আমি বেশি একটা আগ্রহী ছিলাম না। উপহার হিসেবে পাওয়া সস্তা কাগজের ঈশপের গল্প সংকলনের মোটা একটা বই আমার খুব পছন্দ ছিল। জন্মদিনের উপহারের টাকা জমিয়ে কেনা অ্যান্ডারসনের গল্প সমগ্রটাও আমার পছন্দের তালিকায় ছিল। কিন্তু অন্যসব বই—বিশেষত স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের যেসব বই ভালো লাগা উচিত সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে আমার ছিল ভীষণ অনীহা।

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব ওয়র্ম সাহিত্যের বই থেকে কখনো কখনো টানা দু-এক ঘণ্টা আমাদের পড়ে শোনাতেন। বেশির ভাগ সময়েই তিনি কলিনস ক্লাসিক পর্বের *টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি* থেকে পড়তেন। স্কুলের সুখ্যাতি বৃদ্ধির জন্য পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো কারণ এই শ্রেণীকে বলা হতো 'মেধা প্রদর্শনী' শ্রেণী। সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিনিদাদ দ্বীপের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই 'মেধা প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হতো। এই প্রদর্শনীতে জয়ী হওয়া মানে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ লাভ করা। তাছাড়া, এই প্রদর্শনীর পুরস্কার হিসেবে প্রচুর বই দেওয়া হতো। সর্বোপরি এতে জয়ী হতে পারলে নিজের এবং স্কুলের জন্য যে সুনাম অর্জন করা যেত তা ছিল অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার।

মেধা প্রদর্শনী শ্রেণীতে আমাকে পর পর দু'বছর থাকতে হলো। অন্যসব মেধাবী ছাত্রদেরও একই শ্রেণীতে দু'বছর রাখা হলো। প্রথম বছরটা ছিল যাচাই করার বছর। এই সময়ে পুরো দ্বীপে বারোটা মেধা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছর এ সংখ্যা বেড়ে বিশে এসে দাঁড়ায়। বারো হোক অথবা বিশ, স্কুল কর্তৃপক্ষ যতটা সম্ভব বেশি প্রদর্শনীতে অংশ নিতে চাইত। আর তাই ছাত্রদের প্রচুর খাটান হতো। সাদা রঙের সরু একটা বোর্ডের নিচে আমাদেরকে সারি বেঁধে বসানো হতো। মাথায় পাতলা, চকচকে কোঁকড়া চুলের অধিকারী শিক্ষক জনাব বল্ডউইন অনভিজ্ঞ কাঁপা কাঁপা হাতে বোর্ডে ছাত্রদের নাম লিখতেন। যেন তেন ছাত্রদের নাম নয়। গত দশ বছরে এই স্কুলের যেসব ছাত্র মেধা প্রদর্শনীতে জয়ী হয়েছে শুধু তাদের নামই ওই বোর্ডে স্থান পেত। ব্যাপারটি আমাদের জন্য একইসঙ্গে ছিল ভীতিকর এবং গর্বের। আমাদের শ্রেণীকক্ষটা প্রধান শিক্ষক জনাব ওয়র্মের অফিস হিসেবে ব্যবহার হওয়াটাও আমাদের মনে একই ধরনের ভয়-আনন্দ মেশানো দ্বৈত অনুভূতি জাগাত। জনাব ওয়র্ম ছিলেন একজন বয়স্ক অর্ধ কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ। গড়নে ছোটখাটো, মোটাসোটা মানুষটা সবসময় চোখে চশমা আর গায়ে স্যুট পরে থাকতেন। উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করতে তাঁর রীতিমত শ্বাসকষ্ট হতো। আমাদের স্কুলের দালানটা ছিল ছোট্ট। এর দরজা জানালাগুলো সারা বছর খোলা থাকত। স্কুলের শ্রেণীকক্ষগুলো হালকা বেড়া দিয়ে কোনোরকমে পৃথক করা ছিল।

BanglaBook.org

হয়ত এই সংকীর্ণ দালানের ভেতরের কোলাহল ভরা পরিবেশ থেকে মুক্তি দেবার জন্যই তিনি মাঝে মাঝে আমাদেরকে নিয়ে উঠোনের শামান গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন। তাঁর চেয়ারটা উঠোনে বের করে আনা হতো। ক্লাসে ডেস্কের পেছনে যেভাবে বসতেন ঠিক সেভাবেই গাছের গুঁড়ির পাশে রাখা চেয়ারে গা এলিয়ে বসতেন ওয়র্ম স্যার। তাঁকে ঘিরে দাঁড়ানো ছাত্ররা নীরব নিশ্চল থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে যেত। তিনি তার থলথলে হাতে কলিন্স ক্লাসিক সমগ্র নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জোরে জোরে পড়ে যেতেন। দেখে মনে হতো, জুলভার্নের রোমাঞ্চকর গল্প নয়, তিনি গুরুগম্ভীর প্রার্থনা পুস্তক থেকে পবিত্র প্রার্থনা বাক্য পড়ে শোনাচ্ছেন। জুলভার্নের লেখা *টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি* পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় না থাকলেও ওয়র্ম স্যার এই বইটা দিয়েই তার প্রদর্শনী ক্লাসের পড়া শুরু করতেন। প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে আমাদের ভেতর পাঠ্যাভাস গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে পরীক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে ছোট্ট একটু বিরতি দেওয়ার জন্যই পাঠ্যতালিকার বাইরের বই তিনি পড়াতেন। স্কুল পড়ুয়াদের যেসব লেখকের বই পছন্দ করা উচিত তাদের মধ্যে জুলভার্ন অন্যতম। আগেই বলেছি, আমার বয়সী ছেলেমেয়েদের যেসব লেখকের বই পছন্দ করা উচিত তাদের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল কম। তাই জুলভার্ন আমাকে টানত না। অধিকন্তু এই সব ক্লাস আদতে আমাদের ছুটির সময়ে যখন কোনো বিষয় না পড়িয়ে বিরতি দেবার কথা, তখন হতো। ফলে প্রাপ্য ছুটির পরিবর্তে, ঐ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে থেকে পড়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা আমার জন্য ভীষণ কঠিন ছিল। ওয়র্ম স্যারের পড়া প্রতিটি শব্দই আমি বুঝতাম কিন্তু বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিতাম না। সিনেমা দেখার সময়ও এমন হতো। কিন্তু সিনেমা হলে বসে থাকার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে যেটা ওয়র্ম স্যারের ক্লাসে ছিল না। তাঁর পড়ানো জুলভার্নের গল্প থেকে কয়েকটা সাবমেরিন আর কয়েকজন ক্যাপ্টেনের নাম ছাড়া বাকি কোনো কিছুই আমার মাথায় ঢোকেনি অথবা স্মৃতিতে জায়গা করে নিতে পারেনি।

অবশ্য একথা ঠিক যে, এই সময়ের মধ্যে লেখালেখি সম্পর্কে আমার নিজের ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এই সব ধারণা একান্তই ব্যক্তিগত হলেও আশ্চর্যজনকভাবে উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। এই চিন্তাভাবনাগুলো স্কুল থেকে পাওয়া শিক্ষা থেকে একেবারেই আলাদা। ক্রমশ ভেঙে পড়া বর্ধিত হিন্দু পরিবারের বিশৃঙ্খলার ভেতর থেকে এই লেখালেখির ধারণাই আমার ভেতরে লেখক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল। আর এই মহান কাজে উৎসাহী করে তোলা ধারণাগুলো আমি বাবার কাছ থেকে শোনা ছোট ছোট কিছু বিষয় থেকে পেয়েছিলাম। বাবা আমাকে প্রায়ই এটা সেটা পড়ে শোনাতেন।

BanglaBook.org

আমার বাবা ছিলেন একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। নিজের প্রবল আগ্রহ আর পরিশ্রমের জোরে তিনি সাংবাদিক হতে পেরেছিলেন। বাবা তাঁর নিজের মতো করে লেখাপড়া করতেন। যে সময়ের কথা বলছি তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশের কোঠায়। সেই বয়সেও তাঁর শেখা শেষ হয়নি। বাবা একসাথে অনেকগুলো বই পড়া শুরু করতেন যার কোনোটাই হয়ত শেষ করতে পারতেন না। বইয়ের গল্প বা যুক্তি-তর্কের প্রতি বলতে গেলে তাঁর কোনো আগ্রহই ছিল না। লেখকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লেখার কৌশল খুঁজে বের করার জন্যই তিনি বই পড়তেন। এ কারণেই পড়তে তিনি আনন্দ পেতেন। পুরো বই নয়, বইয়ের ছোট কোনো অংশ থেকেই তিনি লেখকের লেখনীর আসল স্বাদটুকু খুঁজে নিতে জানতেন। কোনো বইয়ের কোনো বিশেষ অংশ পছন্দ হলে বাবা তখনই সেটা আমাকে পড়ে শোনাতেন। পড়ার সময় মূল ভাবটুকু ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। এভাবেই আস্তে আস্তে তাঁর পছন্দগুলো আমার নিজের পছন্দে রূপান্তরিত হলো। ফলে স্কুলের জাতিগত বিভেদ মিশ্রিত ঔপনিবেশিক পরিবেশ আর বাড়িতে বিদ্যমান এশিয়ান অন্তর্মুখী আচরণ সত্ত্বেও আমার ভেতর ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে নিজস্ব এক ধারণা গড়ে উঠতে থাকল। বলাই বাহুল্য, আমাকে পড়ে শোনানো বাবার পছন্দের বইয়ের অংশগুলোই এর পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

বারো বছর বয়সের আগেই আমার ইংরেজি সাহিত্য সংকলনে কিছু টুকরো টুকরো সাহিত্য ঠাঁই করে নিল। এর মধ্যে ছিল *জুলিয়াস সিজার*'র কিছু বক্তৃতা, *নিকোলাস নিকলবি*, *অলিভার টুইস্ট* আর *ডেভিড কপারফিল্ডে*'র প্রথম অংশের কয়েকটা পৃষ্ঠা, চার্লস কিংসলের লেখা *হিরোস* থেকে পেরসিউসের গল্প, *দ্য মিল অন দ্য ফ্লসে*'র কয়েকটা পাতা, জোসেফ কনরাডের প্রেম আর মৃত্যু নিয়ে লেখা রোমান্টিক মালয় গল্প, *ল্যাম্বস টেইল অব শেকসপীয়র* থেকে নেওয়া দু-একটা গল্প, গঙ্গা আর ধর্মীয় উৎসব নিয়ে লেখা একটা ব্যঙ্গাত্মক রচনার কয়েকটি পাতা, এলডোজ হাক্সলির *জেসটিং পিলেট*, জে. আর. একারলির *হিন্দু হলিডে*, সমারসেট মমের লেখা গল্পের গোটাকতক পৃষ্ঠা।

ল্যাম্ব আর কিংসলের রচনা আমার কাছে একটু পুরনো ধাঁচের লাগার কথা। কিন্তু বাবার উৎসাহের কারণেই ওসব জটিল লেখা আমি পানির মতো সহজভাবে বুঝতে পারতাম। আমার কাছে সব কিছুই (এমনকি *জুলিয়াস সিজার* পর্যন্ত) রূপকথার গল্পের রূপ ধারণ করত। সব রচনাই যেন অ্যান্ডারসনের লেখা দূরাগত কালের স্রোতে ভাসমান সময়হারা গল্প যা নিয়ে আপন মনে খেলা যায়।

অথচ টুকরো টুকরো লেখা না পড়ে সম্পূর্ণ বই পড়তে গেলেই আমার কাছে সবকিছু দুর্বোধ্য বলে মনে হতো। যে অংশটুকু বাবা পড়ে শোনাতেন তার বাইরে আর কিছু পড়াটা রীতিমত কঠিন মনে হতো। যেটুকু আমি বাবার কাছ থেকে

BanglaBook.org

শুনতাম শুধু সেটুকুই যেন ছিল জাদুময়ী; নিজে নিজে যেটুকু পড়তে চেষ্টা করতাম তা ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমনটা হবার অনেকগুলো কারণের একটি হলো বইয়ের ভাষা আমার জন্য বেশ কঠিন ছিল আর অন্যটি হলো সামাজিক বা ঐতিহাসিক বর্ণনা পড়তে গিয়ে আমাকে প্রায়ই খেই হারিয়ে ফেলতে হতো। কনরাডের গল্পে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়তাম তা আমার চারপাশের পরিবেশের সাথে মানানসই ছিল কিন্তু মালয় দ্বীপকে যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হতো জায়গাটি কল্পনার সীমানার বাইরের অবাস্তব কোনো পরিবেশে যা আমার বোঝার সাধ্য নেই। অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যে লেখকদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের জোরালো উপস্থিতি আমাকে সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে বাধা দিত। গল্পের চরিত্রদের জায়গায় কিছুতেই আমি নিজেকে বসাতে পারতাম না। ফলে হাজার চেষ্টা করেও আমি লন্ডনের মম কিংবা ভারতের হাক্সলি বা একেরলি হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারতাম না।

লেখক হবার ইচ্ছাটা আমার বরাবরই ছিল। কিন্তু এই ইচ্ছাটার সাথে সাথে আরেকটা সত্যও আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম। সেটা হলো লেখক হবার ইচ্ছা যোগানো এই সাহিত্য এসেছে এমন এক জগৎ থেকে যা আমার জীবনের চারদিককার পৃথিবী থেকে একেবারেই আলাদা।

২

আমার পরিবার এশিয়া থেকে অভিবাসন নিয়ে নতুন পৃথিবীর ত্রিনিদাদ দ্বীপাঞ্চলের ছোট্ট এক ফসল আবাদি জমিতে বসবাস করতে শুরু করে। আমাদের বর্ধিত পরিবারটির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে ভারত ছেড়ে চলে এসেছিল। তারপরও আমার কাছে ভারত এক দূরাগত, পৌরাণিক কাহিনির দেশ। আমাদের মন-মানসিকতা গঙ্গা পাড়ের মানুষদের মতো থেকে গেলেও বছরের পর বছর ধরে চারপাশের ঔপনিবেশিক পরিবেশ আমাদের একটু একটু করে নিজের ভেতর টেনে নিচ্ছিল। ওয়র্ম স্যারের প্রদর্শনী পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতির ক্লাসে আমার সুযোগ পাওয়াটা এই পরিবর্তনেরই একটা অংশ। আমাদের বংশের আর কোনো সদস্যই এত অল্প বয়সে এই শ্রেণীতে ভর্তি হবার সুযোগ পায়নি। পরবর্তীতে পরিবারের অন্যরা আমাকে অনুসরণ করে প্রদর্শনী ক্লাসে ভর্তি হতে পেরেছিল কিন্তু আমিই ছিলাম বংশের প্রথম জন।

উনিশ শতকের প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য আচার-আচরণ তখনো আমার ভেতরে ছিল। এই প্রাচীনত্ব যে কেবল আমার আত্মীয়স্বজন আর পরিবারের গণ্ডির ভেতরেই বিদ্যমান ছিল তা নয়। বরং কখনো কখনো চারপাশের সামাজিক ক্ষেত্রেও আমার এই প্রাচীন ভারতীয় মনোভাব জেগে উঠত।

BanglaBook.org

জীবনের প্রথম যে বড়সড় সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা হলো *রামলীলা*'র পালা। সনাতন ধর্মের পবিত্র হিন্দু বীর রামের বনবাস আর পরবর্তীকালে লঙ্কা বিজয়ের কাহিনি নিয়ে রচিত মহাকাব্য রামায়ণের উপর ভিত্তি করে যে গ্রাম্য পালা আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরে অভিনীত হতো তারই নাম *রামলীলা*। আমাদের শহরের এক প্রান্ত জুড়ে থাকা আখের ক্ষেতের মাঝখানে একটি মাঠ ছিল। সেই মাঠেই এই পালা অনুষ্ঠিত হতো। *রামায়ণে*'র চরিত্রদের অনুকরণ করে পুরুষ অভিনেতারা খালি গায়ে অভিনয় করত। তাদের কারো কারো পিঠে থাকত লম্বা ধনুক। পায়ের পাতার উপর ভর করে তারা মঞ্চের উপরে ধীর ছন্দে শিহরিত পদক্ষেপে হেঁটে বেড়াত। শেষের দিকে তারা মঞ্চ থেকে প্রস্থানের জন্য মাটি খুঁড়ে বানানো ঢালু একটা পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে যেত। এই ঐতিহাসিক ঘটনার জমকালো অনুষ্ঠানটি শেষ হতো লঙ্কার দুষ্ট রাজা রাবণের কালো রঙের বিশাল কুশপুত্তলিকা দাহের মধ্য দিয়ে। রাবণের প্রতিমূর্তি পোড়ানোটা এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল। বহু লোক শুধু এই অংশটা দেখতেই অনেক দূর থেকে আমাদের শহরে আসত। বাঁশের ফ্রেমে আলকাতরা মাখানো কালো কাগজ বসিয়ে কাঁচা হাতে বানানো সেই কুশপুত্তলিকা খোলা মাঠে রেখে দেওয়া হতো। প্রতি বছর আগুন জ্বালিয়ে *রামলীলা* উদযাপনের অঙ্গীকার বহন করত ঐ কুশপুত্তলিকা।

রামলীলা'র সবকিছুই ভারতীয় অভিবাসীদের স্মৃতি থেকে তৈরি করা হতো। শিল্পগুণের বিচারে এই পালা ছিল অজস্র ত্রুটিপূর্ণ। তারপরও স্থানীয় সিনেমা হলে *প্রিন্স অ্যান্ড দ্য পপার* অথবা *সিক্সটি গ্লোরিয়াস ডে*'র মতো পশ্চিমা চলচ্চিত্র দেখার সময় যতটুকু বুঝতাম তার চাইতে *রামলীলা* আমার কাছে অনেক বেশি অর্থবহ ছিল। উপরে উল্লিখিত চলচ্চিত্র দুটি আমার দেখা প্রথম চলচ্চিত্র। ওসব চলচ্চিত্র দেখার সময় কাহিনি সম্পর্কে আমার কোনোরকম ধারণা ছিল না। অন্যদিকে *রামায়ণের* কাহিনি জানা থাকায় *রামলীলা* আমার কাছে অনেক বাস্তব আর উত্তেজনাপূর্ণ ছিল।

হিন্দু জাতির জন্য *রামায়ণ* একটি অতি প্রয়োজনীয় গল্প। আমাদের দুটি মহাকাব্যের মধ্যে এটিই তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য। তাই, মহাকাব্যের যেভাবে অমর হয়ে থাকার কথা, *রামায়ণ* সেভাবেই আমাদের মাঝে বেঁচে ছিল। *রামায়নের* কাহিনির বর্ণনা একাধারে শক্তিশালী, মনোমুগ্ধকর এবং প্রতিশীল। এমনকি দৈব ঘটনাবলিও অনেকটাই মানবিক। চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য আর মনোভাব সবসময় সহজেই আলোচনা করা যেত; সকলকে নীতিকথা শেখানোর জন্য *রামায়ণ* ছিল আদর্শ। আমার পরিচিত সব ভারতীয়ই *রামায়ণের* মূল কাহিনি জানত। কেউ কেউ আবার মূল পঙক্তিগুলো হুবহু বলতেও পারত। আমাকে *রামায়ণ* শেখানোর

BanglaBook.org

প্রয়োজন পড়েনি। রামের প্রতি অবিচার আর ঐ বিপদসঙ্কুল স্থানে তার বনবাসের কাহিনি আমার এমনিতেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার সামনে উন্মোচিত হওয়া সকল সাহিত্যের পেছনেই লুকিয়ে ছিল *রামায়ণের* এই কাহিনি। পরবর্তীকালে শহরের অন্যান্য লেখকের লেখা, অ্যান্ডারসন আর ঈশপের গল্প, সর্বোপরি বাবার কাছ থেকে শোনা সমস্ত সাহিত্য বোঝার পেছনে রামায়ণের এই জ্ঞান আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে।

৩

ত্রিনিদাদ দ্বীপটি ছোট্ট, মাত্র ১,৮০০ বর্গ মাইলের মধ্যে অর্ধ মিলিয়ন মানুষের বসবাস। কিন্তু এই জনসংখ্যার ভেতরেই বহু জাতির মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আবার প্রতিটি জাতির নিজস্ব আলাদা জগৎও ছিল।

স্থানীয় একটি পত্রিকায় চাকরি পাবার পর বাবা আমাদের নিয়ে সেখানকার শহরে চলে এলেন। আমাদের আগের বাড়ির চেয়ে জায়গাটা মাত্র বারো মাইল দূরে হলেও এ যেন এক নতুন দেশে চলে আসা। ছোট্ট ভারতীয় গ্রাম্য জীবন, স্মৃতি থেকে গড়ে তোলা ভারতের এক বিচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবির জীবন ফেলে আমরা শহরে চলে এলাম। গ্রাম্য আবহাওয়ার সেই জীবনে আমার আর কখনোই ফিরে যাওয়া হয়নি; সেই জগতের ভাষার সাথে আমার সমস্ত সংস্রব আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়; শহরে চলে আসার পর আর কখনো *রামলীলা* দেখা হয়নি।

শহরে ভারতীয় লোক খুব কম ছিল। রাস্তাঘাটে আমাদের মতো তেমন কাউকে চোখে পড়ত না; নিজেকে সেখানে কেমন যেন অনাহূত আগন্তুকের মতো লাগত। আমরা যেখানটায় থাকতাম সেখানকার সবকটা বাড়ি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বানানো। বাড়িগুলোতে সবসময় হইচই লেগেই থাকত। যদিও নিজের উঠোনে ব্যক্তিগত পরিবেশ বলতে কিছু ছিল না, তারপরও আমরা আমাদের পুরনো ধারার নিজস্ব গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকতাম। আমাদের মানসিকতা আমাদেরকে চারপাশের নানা জাতির সংমিশ্রণে তৈরি ভিন্ন ঔপনিবেশিক পরিবেশ থেকে পৃথক করে রেখেছিল। বারান্দায় দামি ফার্নের গাছ ঝুলত এমন কিছু অভিজাত বাড়িও এলাকায় ছিল। তবে বেড়াহীন উঠোনের সাথে লাগোয়া জরাজীর্ণ বাড়িগুলোর ভিড়ে তা তেমন চোখে পড়ার নয়। শ্রীহীন এই বাড়িগুলোর বদ্ধ কুঠুরির মতো তিন চারটা কক্ষ থাকত। বাড়িগুলো দেখে শত বছর আগেকার দাসদাসীদের আবাসস্থল বলে মনে হতো। এই সব বাড়ির বাসিন্দারা উঠানের কিছু পানির কল ভাগাভাগি করে ব্যবহার করত। এলাকার রাস্তায় সারাক্ষণ লোকজনের কর্কশ কণ্ঠের চেঁচামেচি শোনা যেত, আর বড় রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় ছিল বিশাল আকারের মার্কিন সামরিক ঘাঁটি।

BanglaBook.org

ওয়র্ম স্যারের ক্লাসে যখন আমি স্থান পেলাম তখন শহরে আমার তৃতীয় বছর চলছে। এই তিন বছরে আমি যতটুকু সম্ভব মুখস্থ বিদ্যা অর্জন করেছি, যা কিছু দেখেছি বা পড়েছি তা মনে রাখার চেষ্টা করেছি। তবে বিমূর্ত ভাবনার সাথে বেঁচে থেকে খুব অল্প বিষয়ই সত্যিকারভাবে বুঝতে পেরেছি। আমার অবস্থা ছিল সিনেমা শোতে আধাঘণ্টা পরে ঢুকে কাহিনিকে বিচ্ছিন্নভাবে বুঝতে পারা দর্শকের মতো। ইংল্যান্ডে চলে যাবার আগের বারোটা বছর এভাবেই কেটে গিয়েছিল। সারাক্ষণই নিজেকে এক অচেনা আগন্তুকের মতো মনে হতো। অন্যসব দলের মানুষদের আমি দলের বাইরে থেকে দেখতাম; স্কুলের বন্ধুদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা স্কুল আর বাড়ির পথ পেরিয়ে আমার ঘরোয়া জীবনে কখনো প্রবেশ করতে পারেনি। কোথায় আছি সে সম্পর্কে আমার কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না, তার চেয়ে বড় কথা হলো সে ধারণা খুঁজে বের করার সময় ও সুযোগ কোনোটাই আমার হয়নি। কেবল প্রথম উনিশ মাস বাদে সেই বারোটা বছরের বাকিটা সময় আমার অন্ধ ঔপনিবেশিকতাবাদী শিক্ষা গ্রহণে কেটে যায়। এভাবে খুব শীঘ্রই আমি বুঝতে শিখলাম যে আমাদের এই ঔপনিবেশিক জগৎটা বাইরের বিশাল জগতের তুচ্ছ এক ছায়া মাত্র। মূলত ইংল্যান্ড, সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা নিয়ে গঠিত এই বিশাল বহির্জগৎই আমাদের ঔপনিবেশিক জগৎটাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে। ওই বহির্জগৎ থেকেই আমাদের শাসন করার জন্য গভর্নর পাঠানো হয়। দাসপ্রথার যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সস্তা শুকনো খাবার দ্বীপবাসীর জন্য পাঠানো হয় সেটাও বাইরের ওই জগৎ থেকেই আসে (এইসব খাবারের মধ্যে আছে স্মোকড হেরিং মাছ, নোনা কড মাছ, জমানো দুধ, তেলে ডুবানো নতুন সার্ডিন)। বিশেষ ওষুধপত্র (ডোর্ডের কিডনির ওষুধ, ডাক্তার স্লোনের মালিশ মলম, ৬৬৬ নামের শক্তিবর্ধক ওষুধ) ওখান থেকেই আমদানি হতো। ওখান থেকে আমাদের কাছে ইংল্যান্ডের মুদ্রাও পাঠানো হতো। অবশ্য যুদ্ধের সময় এই চালানটা বন্ধ ছিল। তখন আমরা কানাডার ডাইম আর নিকেল ব্যবহার করতাম ইংল্যান্ডের আধা পেনি আর আধা ক্রাউন থেকে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সেন্ট আর ডলার ব্যবহার করা শুরু করি; আধা পেনির পরিবর্তে এক সেন্ট, এক শিলিঙের পরিবর্তে চব্বিশ সেন্ট।

বাইরের জগৎ থেকে আমাদের জগতে পাঠ্য বই (যেমন রিভিংটনের *শিলিং অ্যারিথমেটিক*, নেসফিল্ডের *গ্রামার*) এবং বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও পাঠানো হতো। দ্বীপবাসীদের মানবিক ও কল্পনার চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র সেই সাথে *লাইফ* আর *টাইম* পত্রিকাও ওখান থেকেই আসত। ওয়ার্ম স্যারের অফিসে *দ্য ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ*-এর নিয়মিত কপি, এভরিম্যান'স লাইব্রেরি, জুলভার্ন'র বই, পেঙ্গুইন প্রকাশনীর কলিন্স ক্লাসিকস'র বই—সবই

BanglaBook.org

আমরা পেতাম ওই বহির্বিশ্ব থেকেই। সর্বোপরি, বাবার মাধ্যমে আমার পড়া সাহিত্য সংকলনগুলোও ঐ জগৎ থেকেই আনা হতো।

পূর্বেই বলেছি, আমি নিজে নিজে বইগুলো পড়তে গেলে কিছুই বুঝতাম না। বইয়ের অর্থ বোঝার জন্য যে কল্পনার চাবিকাঠি প্রয়োজন হয় তা আমার ছিল না। এর মূল কারণ আমার সীমিত সামাজিক জ্ঞান; ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের দুর্বল স্মৃতি আর আগন্তুক হিসেবে দেখা মিশ্র ঔপনিবেশিক জগৎ থেকে যতটুকু আমি শিখেছিলাম তা দিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত সব শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত সাহিত্য আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। ওই সাহিত্য আর আমার ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে ইংরেজি পাঠ্যক্রমভুক্ত গল্পগুলো আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না (*স্প্যারো ইন সার্চ অব এক্সপালশন* শিরোনামের গল্পটি তেমনই একটা গল্প ছিল। ওয়ার্ম স্যারের ছোট্ট পাঠাগারে বইটির নতুন আমদানি হয়েছিল)। পরবর্তীতে যখন আমি মাধ্যমিক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই (প্রদর্শনী পরীক্ষায় আমি জয়ী হয়েছিলাম), স্কুলের পাঠাগার থেকে নেওয়া রোমাঞ্চ বা অভিযান কাহিনিগুলো বুঝতেও আমাকে গলদঘর্ম হতে হতো। যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের অভিজাত রীতি অনুযায়ী চমৎকারভাবে চামড়ায় বাঁধাই করা *দ্য বুচান, দ্য সাপার, দ্য সাবাতিনি, দ্য স্যাক্স রোহমার* প্রভৃতি বইয়ের প্রচ্ছদে সোনালি হরফে স্কুলের সিলমোহর দেওয়া থাকত। এই সমস্ত বইয়ের ভেতর পাঠকদের জন্য যে কৃত্রিম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করা হতো তার প্রকৃত উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারতাম না; গোয়েন্দা কাহিনিগুলোর প্রতিও আমার একই মনোভাব ছিল (সব গোয়েন্দা কাহিনিতেই সামান্য কোনো ধাঁধার উত্তর খুঁজতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে পাঠককে অনেকদূর পর্যন্ত পড়ে যেতে হয়)। আবার অন্যদিকে যখন বিশেষ লেখকদের খ্যাতি সম্পর্কে কোনোরকম ধারণা ছাড়াই সাধারণ কাহিনি নিয়ে লেখা ইংরেজি উপন্যাস পড়া চেষ্টা করতাম তখন উপন্যাসের মানুষগুলোর বাস্তবতা, লেখার ধরনের কৃত্রিমতা, পুরো কাহিনির প্রেক্ষাপটের পেছনের উদ্দেশ্য অথবা পাঠক হিসেবে উপন্যাসের শেষে আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে এই টাইপের একগাদা প্রশ্ন এসে মনে ভিড় করত। এই রকমের বহুমুখী প্রশ্নের বাণে জর্জরিত হয়ে এইসব রচনাবলি থেকে আমি সাহিত্যের প্রকৃত রস আস্বাদনে ব্যর্থ হতাম। মূলত আমার ব্যক্তিগত সাহিত্য সংকলন আর বাবার শিক্ষার গুণে লেখালেখি সম্পর্কে আমার জ্ঞান গভীরতর হয়। লেখালেখির প্রতি আমার এই মনোভাব জোসেফ কনরাডের সাথে কিছুটা মিলে যায়। এই মিলটা আমি তখন না বুঝলেও পরবর্তীতে সহজেই আবিষ্কার করতে পারি। কনরাডের লেখা তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমার নিজের লেখালেখি অবশ্য কনরাডের লেখার ধরন এবং বিষয়বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় শুরু হয়েছিল কনরাডের লেখার সাথে নিজের চিন্তা ভাবনার মিল খুঁজে পেতে

BanglaBook.org

আমার বেশ সময় লেগেছিল। কনরাডকে তার এক বন্ধু নিজের লেখা একটি উপন্যাস পাঠায়। উপন্যাসটিতে অনেকগুলো প্লট বা কাহিনির কাঠামোর ব্যবহার ছিল। উপন্যাসটি পড়ার পর কনরাড মতামত দেন যে, মানুষের মনের অজানা জগতের রুদ্ধদ্বার খোলার ক্ষেত্রে উপন্যাসটির কাহিনিগুলো ব্যর্থ হয়েছে। তার মতে, উপন্যাসটির প্লট কেবল এমন কিছু কাহিনি জাল একসাথে বুনেছে যাকে সোজা ভাষায় বলা যায় নিছক দুর্ঘটনা। বন্ধুকে লেখা চিঠিতে কনরাড জানিয়েছেন, "কাহিনির কৃত্রিমতার কারণে পুরো উপন্যাসে চমক আর সত্য বর্জিত হয়েছে, যার কারণে কাহিনিটা অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।"

কনরাড এবং এই উপন্যাসের (*আন্ডার ওয়েস্টার্ন আইজ*) লেখক (কনরাডের বন্ধু) দু'জনের মতেই প্রতিটা গল্পের ভেতর শিক্ষামূলক কোনো নীতি আবিষ্কার করা প্রয়োজন। আমি নিজেও এই একই মনোভাব পোষণ করি। আগেই বলেছি লেখালেখির শুরুতে ব্যাপারটা আমি নিজেও জানতাম না। কনরাডের মতো একই মনোভাব আমার ভেতর গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করেছে আমার পড়া *রামায়ণ*, ঈশপ, অ্যান্ডারসন এবং আমার ব্যক্তিগত সাহিত্য সংকলন (এমনকি মো'পাসা এবং ও হেনরির লেখাও)। কনরাডের সাথে যখন এইচ. জি ওয়েলসের পরিচয় হয় তখন কনরাডের গল্প বলার ঢং সম্পর্কে ওয়েলসের ধারণা পুরোপুরি ইতিবাচক ছিল না। ওয়েলসের অভিযোগ ছিল, কনরাড কাহিনি সোজাসুজি না বলে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে গল্প বলেন। প্রত্যুত্তরে কনরাড প্রশ্ন ছুড়ে বলেছিলেন, " প্রিয় ওয়েলস, লাভ *অ্যান্ড মিস্টার লুইশাম* কী নিয়ে লেখা হয়েছে? জেন অস্টিনের রচনাগুলোতে আসলে কী বলা হয়েছে? সমগ্র সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যটাই বা কী?"

আশ্চর্যজনকভাবে মাধ্যমিক স্কুলে সাহিত্যের প্রতি আমার মনোভাব কনরাডের ঐ প্রশ্নগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়। পরবর্তী অনেকগুলো বছর আমার মনোভাব ঠিক ঐরকমই ছিল কিন্তু ব্যাপারটা তখন আমি খুলে বলার সাহস করতে পারিনি। আমার মনে হতো এসব কথা বলার অধিকার আমার নেই। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি সাহিত্য বোঝার মতো উপযুক্ত পাঠক হয়ে উঠতে পারিনি। সেই বয়সে ইংল্যান্ডে আমার সাতটি বছর কেটে গেছে। তার মাঝে চার বছর কেটেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজি তথা ইয়োরোপিয়ান গল্প বোঝার জন্য যে সামান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান প্রয়োজন হয় সেটা আমি ততদিনে অর্জন করে ফেলেছি। আমি নিজেও তখন লেখালেখি শুরু করে দিয়েছি। ফলে, সাহিত্য রচনাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার ক্ষমতাও আমার জন্মেছে। তার আগ পর্যন্ত আমি লেখার ধরনের গুণাগুণ বিচার না করে, কিছু না বুঝে অন্ধের মতো কেবল পড়ে যেতাম। তখনো আমার জানা ছিল না যে কীভাবে বানানো গল্পকে যাচাই করতে হয়।

BanglaBook.org

মাধ্যমিক স্কুলে থাকাকালীন আমার ব্যক্তিগত সাহিত্য সংকলনে কিছু অবশ্যম্ভাবী রচনা যুক্ত করতে হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে তখনকার সামাজিক পরিবেশ নিয়ে বাবার লেখা রচনাই আমার সবচেয়ে পরিচিত আর প্রিয় লেখা ছিল। ওগুলো লিখতে তাঁর কী পরিমাণ পরিশ্রম হয়েছে তা আমি কাছ থেকে দেখেছি। ঐ লেখাগুলো আমাকে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মজবুত কিছু ধারণা দিয়েছিল। বাবার ওসব রচনা না পড়লে নিজেদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। বাবার রচনা ছাড়াও আমার এক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের কারণে আরও তিনটি রচনা আমার সাহিত্য সংকলনে স্থান পায়। এগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে *টারটাফ* যেটা আমার কাছে ভীতিকর এক রূপকথার মতো মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়টি ছিল *সাইরানো ডি বারজেরাক* যা কিনা মানুষের গভীরতম অনুভূতিকে নাড়া দিতে পারার মতো শক্তিশালী। শেষটি ছিল ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে প্রথমবারের মতো দ্রুত গতি ও শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে রচিত স্প্যানিশ পিকারেস্ক গল্প *লাজারিলো ডি টরমেস*। এর মধ্যে শেষের রচনাটিই আমাকে এমন এক জগতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় যার সাথে আমার পূর্বপরিচিত জগতের মিল ছিল।

এই হলো আমার ব্যক্তিগত সাহিত্য সংকলনের বর্ণনা। ত্রিনিদাদ দ্বীপের শিক্ষাজীবনে এইগুলোই আমি পড়েছি। নিজেকে তখনো আমি সত্যিকার অর্থে পাঠক হিসেবে ভাবতে পারতাম না। বই পড়তে পড়তে নিজেকে হারিয়ে বইয়ের জগতে ডুবে যাবার ক্ষমতা আমার কখনোই ছিল না। বাবার মতোই আমি একটা বইয়ের টুকরো টুকরো কিছু অংশ পড়তে পছন্দ করতাম। স্কুলে যে রচনা আমাকে লিখতে হতো সেগুলোর ভেতর কোনো নতুনত্ব ছিল না। মুখস্থ বিদ্যা দিয়েই ওগুলো আমি লিখতাম। বাবার লেখা গল্পের উদাহরণ ছাড়া লেখালেখি করার মতো নিরেট গল্প আমার মাথায় আসত না। তারপরও নিজেকে আমি লেখক ভাবতেই পছন্দ করতাম।

সে সময়ে লেখক হওয়াটা আমার সত্যিকারের লক্ষ্য ছিল না। বরং ওটা ছিল আমার আত্মমর্যাদাবোধ, মুক্তির স্বপ্ন আর মহান সামজিক মর্যাদা অর্জনের একটা উপায় মাত্র। বংশের মধ্যে আমাদের পরিবার তথা আমার জীবন সবসময়ই ছিল শিকড়হীন। আমার বাবা এতিম না হলেও ছেলেবেলা থেকেই একপ্রকার গৃহহীন ছিলেন। আর সেজন্যই আমরা স্বনির্ভর হতে পেরেছিলাম। সাংবাদিক হিসেবে বাবা যৎসামান্যই বেতন পেতেন। কয়েকটা বছর আমাদের নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটে কেটেছে; এমনকি মাথা গোঁজার ভালো মতো একটা ঠাঁইও ছিল না। স্কুলে আমি বেশ ভালো ছাত্র ছিলাম। তারপরও রাস্তাঘাটে চলার সময় নিজেদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে আমি কুণ্ঠিত হতাম। অবাক ব্যাপার হলো যে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবার পরে যখন আমরা ভালো একটা বাড়িতে উঠে গেলাম তখনো আমি মনে মনে শঙ্কিত থাকতাম। সামাজিক অবস্থান নিয়ে অতি পরিচিত দুঃসহ এক অনুভূতি আমাকে সবসময় অস্থির করে রাখত।

BanglaBook.org

৪

ঔপনিবেশিক সরকার প্রতি বছর ত্রিনিদাদ দ্বীপের সব উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে চারটি বৃত্তি প্রদান করত। সমস্ত স্কুলের বাছাই করা সেরা ছাত্রদের ভেতর থেকে মনোনীত চারজনকে ভাষা, আধুনিক পাঠ, বিজ্ঞান আর গণিত বিষয়ে এই বৃত্তি দেওয়া হতো। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংল্যান্ড থেকে আমাদের দ্বীপে পাঠানো হতো। আবার উত্তরপত্রগুলোও নিরীক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে ফেরত যেত। বৃত্তির টাকার পরিমাণ নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকার কোনো কার্পণ্য করত না। তাদের বৃত্তি দেবার উদ্দেশ্যই ছিল মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। বৃত্তিধারী ছাত্রছাত্রীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি খরচে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। সরকার সাত বছর ধরে তাদের সমস্ত খরচ বহন করত। বছরের পর বছর ধরে মুখস্থ বিদ্যা অর্জন করে এই বৃত্তি জিতে নিতে আমার যে পরিশ্রম হয়েছে তা এখন চিন্তা করতেও আমার কষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত যখন বৃত্তিটা পেলাম তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজিতে তিন বছরের কোর্সটা করব। কোর্সের বিষয় সম্পর্কে আমার খুব সামান্যই জ্ঞান ছিল। মূলত দ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের জগৎটাকে দেখার সুযোগ কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই কোর্সটা নিয়েছিলাম। তাছাড়া, নিজের ইচ্ছাটাকে পূরণ করতে অর্থাৎ লেখক হবার জন্যও এই বিষয়ে পড়াশোনা করাটাকেই উত্তম মনে করেছিলাম।

লেখক হওয়া বলতে তখন আমি বুঝতাম উপন্যাস আর গল্প লেখা। নিজের সাহিত্য পড়ার অভিজ্ঞতা আর বাবার উদাহরণ দেখে দেখে আমার কাছে এটাই লেখক হবার স্বাভাবিক পন্থা মনে হতো। অবাক ব্যাপার হলো গদ্য লেখক হবার এই ধারণাটিকে আমি কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন করিনি। অথচ বলতে গেলে ব্যাপারটা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। কারণ, ছেলেবেলা থেকে আমি আর দশটা বাচ্চার মতো কখনো গল্প বানাতে পারতাম না। স্কুলের মুখস্থ বিদ্যা অর্জনের সময়টাতে আমার কল্পনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বই পড়াতে নয়, বরং সিনেমা দেখাতে খরচ হয়েছে। কখনো কখনো লেখক হিসেবে নিজের ক্ষমতার ঝুলিটাকে শূন্য ভেবে ভয় পেতাম—আর তখন যেন কোনো এক অদৃশ্য জাদুমন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজেকে আমি সান্ত্বনা দিতাম। ভাবতাম অবশ্যই এই শূন্যতা একদিন পূরণ হয়ে যাবে, বইয়ের পর বই লিখে যাব আমি।

অক্সফোর্ডের কষ্টার্জিত বৃত্তি পাবার পর আমার লেখালেখি করার সময় এসেছে বলে মনে হলো। কিন্তু বাস্তবে আমার লেখার শূন্য থলিটা একেবারে ফাঁকাই রয়ে গেল। ফিকশন আর উপন্যাস লেখার কাঠামোটা আমার কাছে তখনো মস্ত ধাঁধার মতো যেখানে উপন্যাসের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হচ্ছে এটি হলো একটি

BanglaBook.org

কল্পকাহিনি বা ফিকশন তৈরি করা অন্যদিকে আবার এই কাহিনি হতে হবে সত্যের মতো, জীবন থেকে নেওয়া। সুতরাং সংজ্ঞার দ্বিতীয় অংশটা তার প্রথম অংশ অর্থাৎ ফিকশন তৈরির ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে বাস্তবতাকে দেখতে বলে, এবং উপন্যাসের এই বিষয়টিই আমাকে ধন্দে ফেলে দিত।

পরবর্তীকালে আমি যখন আমার লেখার বিষয়বস্তু আর উপকরণগুলো চিনতে শুরু করলাম এবং নিজের প্রজ্ঞার ওপর ভর করে আংশিক বা পুরোপুরি লেখক হয়ে উঠলাম তখন উপন্যাসের সংজ্ঞা বিষয়ক এই অস্পষ্টতাটুকু দূর হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য এই পরিবর্তনটা আসে ১৯৫৫ সালে। এ সময় ইভলিন ওয়াটের দেওয়া ফিকশনের সংজ্ঞাটি (ঐ বছর প্রকাশিত *ইন দ্য ডেডিকেশন টু অফিসারস অ্যান্ড জেন্টলম্যান*-এ ওই সংজ্ঞাটি ছিল) আমি পড়ি। ইভলিন বলেছেন ফিকশন হচ্ছে "সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত অভিজ্ঞতা।" কয়েক বছর আগে হলে এই সংজ্ঞাটি আমি বুঝতাম না, বুঝলেও হয়ত সেটি বিশ্বাসে নিতে পারতাম না। কিন্তু ১৯৫৫ সালে ইভলিনের দেওয়া এই সংজ্ঞাটিই আমাকে ফিকশন লেখা বিষয়ক ধাঁধার জবাব দিয়ে দেয়।

এর প্রায় চল্লিশ বছর পর, টলস্টয়ের *সেবাস্টোপোল স্কেচেস* পড়তে গিয়ে লেখক হিসেবে নিজের প্রথম দিককার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যায়। ফিকশনের সংজ্ঞা বুঝতে পারার পর আমার সামনে যেন একটা বন্ধ পথ খুলে গিয়েছিল। *সেবাস্টোপোল স্কেচেস* এ আমি আমার মতোই তরুণ টলস্টয়কে দেখতে পেলাম যে ফিকশন আবিষ্কারের তীব্র নেশায় ছুটে বেড়াচ্ছে। টলস্টয় শুরু করেছিলেন সাবধানী বর্ণনামূলক লেখা দিয়ে (সে সময় তার লেখার ধরন ছিল রাশিয়ার লেখক উইলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেলের মতো, যিনি বয়সে টলস্টয়ের চেয়ে খুব বেশি বড় ছিলেন না। রাসেল ছিলেন টাইমস পত্রিকার নিয়মিত লেখক)। এরপর টলস্টয় সেবাস্টোপোল নগরী দখলের ভয়াবহতা আরও ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় আরেকটি সহজতর পথ খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে একসময় তিনি সেটি পেয়েও গেলেন। এই সহজতর পথটিই হলো ফিকশন যেখানে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলে বাস্তবতাকে পাঠকের আরও কাছে নিয়ে আসা যায়।

লেখালেখি নিয়ে টলস্টয়ের মতোই একটা আবিষ্কার আমি করেছিলাম। তবে সেটি অবশ্যই আমার অক্সফোর্ড জীবনে নয়। অক্সফোর্ডে তিন বছরের কোর্স করার সময় আবিষ্কার করার মতো কোনো জাদুকাঠির ছোঁয়া আমি পাইনি। এমনকি ঔপনিবেশিক সরকারের দেওয়া আরেকটি বৃত্তি বছরও আমার লেখালেখির কোনো কাজে আসেনি এ সময়টুকুতে ফিকশনের পুরনো সংজ্ঞা অর্থাৎ গল্প তৈরি করার সংজ্ঞা নিয়েই আমাকে তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এই তৈরি করা গল্প (কনরাডের ভাষায় 'দুর্ঘটনা') নিয়ে কতখানিই বা লেখা যায়? এ ধরনের

BanglaBook.org

লেখার মূল্য বা যৌক্তিক কারণই বা কী হতে পারে? এ রকম আরও অনেক নিরাশা ছাড়াও সেসময় আমি হঠাৎ করে উপলব্ধি করলাম যে লেখকদের অন্য যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন সেগুলোও আমার নেই। আমার ব্যক্তিসত্তা একজন লেখকের ব্যক্তিত্বের সাথে হাস্যকরভাবে সামঞ্জস্যহীন। একটা টেবিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে লেখার চেষ্টা বা ভান করার ভেতর আমি কোনো আনন্দ পাই না। এ ধরনের চেষ্টায় নিজেকে আমার আত্ম-সচেতন আর নকল লেখক বলে মনে হয়।

এ অবস্থায় লেখক হবার বাসনাটাকে আমার ছেলেবেলার ছেলেমানুষী খেয়াল বলে মনে হতে থাকে। বলা যায় লেখক হবার ইচ্ছাটা একটা বোঝার মতো ধীরে ধীরে আমার উপর চেপে বসতে থাকে। হাতে যদি অল্প কিছু টাকা অথবা ভালো কোনো চাকরির সুযোগ থাকত তবে হয়ত লেখালেখির ইচ্ছটাকে আমি সেখানেই বিসর্জন দিতাম। কিন্তু যেহেতু আমার হাতে টাকা পয়সা বা অন্য কোনো উপায় ছিল না তাই ঐ ইচ্ছাটার ওপরই নির্ভর করে আমাকে বসে থাকতে হলো।

তখন আমি প্রায় নিঃস্ব। বৃত্তির সব টাকা বেহিসাবি খরচের ফলে কেবল বাড়ি ফেরার প্লেন ভাড়াটুকই বাকি আছে। নিজের পকেটে মাত্র ছয় পাউন্ড সম্বল করে আমি লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনায় অক্সফোর্ড ছেড়ে লন্ডনে চলে এলাম। চরম ওই দুঃসময়ে আমার চেয়ে বয়সে বড় এক চাচাতো ভাই আমাকে আশ্রয় দেয়। ভাইটি নিজেও তখন মারাত্মক অর্থকষ্টে ছিল। সিগারেট ফ্যাক্টরিতে কাজ করে নিজের পড়ার খরচ সে নিজেই চালাত। আমার লেখক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সে যথেষ্ট সম্মান করত। লন্ডনের পরবর্তী পাঁচটি মাস আমি তার সাথে প্যাডিংটনের বেসমেন্টের অন্ধকার এক কুঠুরিতে কাটিয়ে দিলাম।

এই পাঁচ মাসে আমার লেখালেখির কোনো উন্নতি হয়নি। পরবর্তী পাঁচ মাসও একই ভাবে কেটে যায়। এরপর বলা যায় একদম হঠাৎ করেই একদিন আমি লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে পেলাম। ভেবে দেখলাম, ছেলেবেলার যে মিশ্র সংস্কৃতির শহরে আমরা আগন্তুকের মতো নিজেদের আটকিয়ে রাখতাম, সেটা নিয়েই তো লেখা যায়! অথবা তারও আগের গ্রাম্য জীবন যেখানে ভারতীয় জীবনের আচার আচারণের স্মৃতিকে আমরা বাস্তবে রূপ দিতাম সেটাও লেখার বিষয়বস্তু হতে পারে। উপকরণগুলো খুঁজে পাবার পর এগুলো নিয়েই লেখাটাই সহজ আর অবশ্যম্ভাবী মনে হলো; নিশ্চিত হতাশার অন্ধকারে আমি একটু একটু করে আশার আলো দেখতে শুরু করলাম। এই পথটা খুঁজে পেতে আমার প্রায় চার বছর সময় লেগেছিল প্রায় একই সময়ে আমি লেখার উপযুক্ত ভাষা, লেখকের কণ্ঠ আর কণ্ঠের ধরনও খুঁজে পেলাম। মনে হলো লেখকের কণ্ঠ, বিষয়বস্তু আর কাঠামো যেন একে অন্যের সাথে পূর্বনির্ধারিতভাবে অঙ্গাঅঙ্গি জড়িত ছিল।

BanglaBook.org

ভাষা প্রদানকারী সেই কণ্ঠের একটা অংশ আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেলাম। আমাদের গ্রাম্য জীবনে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর গল্প বাবা এই স্বরেই বলতেন। কণ্ঠের আরেকটা অংশ ষষ্ঠ শতকের অজানা স্প্যানিশ লেখকের লেখা *লাজারিলো* থেকে এল। (অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় বছরে আমি পেঙ্গুইন ক্লাসিক প্রকাশনীর সম্পাদক ই.ভি রিউ কে *লাজারিলো* অনুবাদ করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। চিঠির উত্তরে তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে স্বহস্তে উত্তর পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন *লাজারিলো* অনুবাদ করাটা খুবই দুঃসাধ্য এবং এটিকে তিনি ক্লাসিক বলে গণ্য করেন না।) এরপরও আমার লেখালেখি না করতে পারা সময়টাতে আমি কোনো কাজ না পেয়ে *লাজারিলো* এর সম্পূর্ণ অনুবাদ করে ফেলেছিলাম। বাবা এবং *লাজারিলো* থেকে পাওয়া কণ্ঠ দুটির মিশ্র ভাষা আমার লেখার জন্য একেবারে মিলে গেল। প্রথম যখন এই ভাষায় লেখা শুরু করলাম তখনো এটি পুরোপুরি আমার নিজের হয়ে ওঠেনি। তারপরও এতে লেখালেখি করতে কোনো অসুবিধা হলো না। আস্তে আস্তে ভাষাটি আমার আয়ত্তে চলে আসল। আসলে লেখার কণ্ঠটিকে খুঁজে বের করতেই আমার সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম হয়েছে। তারপর একটু একটু করে মাথার ভেতর এই কণ্ঠের কথা বলায় আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। এভাবে সময়ের সাথে সাথে কখন এই কণ্ঠটা সঠিক বলছে আর কখন ভুলের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে শিখলাম।

লেখক হিসেবে লিখতে শুরু করার জন্য আমাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হলো। মনে মনে আমাকে পেছন দিকে হাঁটতে হলো, অক্সফোর্ড আর লন্ডন ভুলে যেয়ে ছেলেবেলার সাহিত্য জ্ঞানকে ঝালাই করতে হলো। এসব জ্ঞানের মধ্যে কিছু ছিল যা নিয়ে আমি কখনোই কারো সাথে আলোচনা করিনি আর সেগুলোই নিজের চারপাশ সম্পর্কে আমার একান্ত ধারণাগুলো গড়ে তুলল।

৫

আমার লেখক হবার কল্পনার জগতে সত্যিকারের বই লেখার ব্যাপারে কী করতে হবে সেটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। তবে মনে হয়, আমি ভেবেছিলাম কোনোরকমে প্রথম বইটা লিখে ফেলতে পারলেই পরেরগুলো আপনাতেই লেখা হয়ে যাবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখলাম ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আমার লেখার বিষয়বস্তু বা উপকরণ এতে বাদ সেধে বসল। লেখক জীবনের শুরুর দিকে নতুন একটা বই লিখতে বসলেই পুরনো সেই শূন্যতা আমাকে ঘিরে ধরত। তারপর আবার সেই শুরুতেই ফিরে যেতে হতো। পরের বইগুলো লেখার সময় প্রথমটার মতোই ঘটনা ঘটল। নাছোড়বান্দার মতো আমি একটা বিষয়বস্তু বা ধারণাকে ছেলেমানুষের

BanglaBook.org

মতো আমি আঁকড়ে ধরলাম। সেই উপকরণ কোথায় গিয়ে শেষ হবে সে ব্যাপারে স্বচ্ছ কোনো ধারণাই আমার ছিল না এভাবে লিখতে লিখতে একসময় আমার জ্ঞান বাড়ল। প্রতিটা বই লেখার অভিজ্ঞতা আমার বোঝার ক্ষমতা আর অনুভূতিবোধকে আরও গভীর করে তুলল। ফলে একসময় আমি ভিন্ন ধারার লেখা শুরু করার ক্ষমতা আবিষ্কার করতে সমর্থ হলাম। লেখার ধারা আবিষ্কার চক্রে প্রতিটা বই-ই এক একটা ধাপ, কোনো ধাপেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে না। আমার লেখার বিষয়বস্তু হলো আমার অতীত যা ভিন্ন পরিবেশে আমার কাছ থেকে আজ পৃথক আর এই বিষয়বস্তু স্থির ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঠিক আমার ছেলেবেলার মতোই এর সাথে নতুন কিছু যুক্ত করার উপায় নেই। লেখার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে পাঁচ বছর ধরে একই বিষয়বস্তু ব্যবহার করে লেখার পর একসময় আমার লেখার সব উপকরণ ফুরিয়ে গেল। আমার লেখার কাল্পনিক ক্ষমতা যেন একটি চকে লেখার ব্ল্যাকবোর্ড, প্রতিটা ধাপ লেখার সময় মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে ফেলতে শেষে আবার শূন্য হয়ে যায়—ল্যাটিন ভাষায় যাকে বলে ট্যাবুলা রাসা বা শূন্য শ্লেট।

ফিকশন আমাকে যথাসম্ভব এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে কয়েকটা ব্যাপারে আমার গদ্য লেখার ক্ষমতা একেবারেই নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইংল্যান্ডে যে ক'বছর ছিলাম ঐ সময়ের সামাজিক অভিজ্ঞতায় কোনো গভীরতা ছিল না তাই সে কটা বছর নিয়ে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওটা নিয়ে লিখলে কেবল আত্মজীবনী লেখা সম্ভব। সেই আত্মজীবনীর বিষয়বস্তু হবে বৃহত্তর জগৎ সম্পর্কে আমার ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের বিস্তার। ফিকশনের প্রকৃতি অনুসারেই আমার উপন্যাস লেখার ক্ষমতা কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিসরেই কাজ করতে পারছিল। ফলে আমার গদ্য লেখার ক্ষমতা আমাকে কেবলই পেছনের দিকে, বিশেষত দ্বীপের ঔপনিবেশিক জীবনে অথবা আমার ছেলেবেলার জগতে ঠেলে নিয়ে যেত। তাই বর্তমানের বিশাল জগৎ থেকে ক্ষুদ্রতর পরিসরেই আমাকে গদ্য লিখতে হতো যে ফিকশন একদা আমাকে শূন্যতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন পথের আলো দেখিয়েছিল, সেই ফিকশনই আমাকে তখনকার বর্তমান সত্তার চেয়ে ছোট হতে বাধ্য করেছিল। প্রায় তিন চার বছর এই একই গণ্ডিতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। কীভাবে আরও সামনে এগুনো যায় সেটা আমি কিছুতেই ঠাওর করতে পারছিলাম না।

প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের অধিকাংশ সময়টাই আমি আগন্তুকের মতো এমন সব দেশে কাটিয়ে দিয়েছি যেখানে আমি একজন শিকড়বিহীন মানুষ। আমার লেখক সত্তা এই অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাইরে কিছুতেই বের হতে পারছিল না বার বারই আমি সেই আগন্তুক অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করতাম যারা আমার মতোই শিকড়বিহীন আগন্তুক জীবন কাটিয়েছে। এ ধরনের

Bangnabook.org

লেখা সৃষ্টির পথ আমি সহজেই খুঁজে পেতাম; তবে এটিকে আমি কখনোই আমার সীমাবদ্ধতা হিসেবে অনুভব করিনি। এটা ঠিক যে কেবল উপন্যাসের ওপর নির্ভর করে লেখালেখি চালিয়ে গেলে অল্প সময়ের ভেতরই আমার লেখার উপকরণ ফুরিয়ে যেত। অনেক আগে থেকেই এ বিষয়টি নিয়ে আমি ভেবেছিলাম। সেজন্যই নিজে নিজে বর্ণনামূলক গদ্য লেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলাম। সেই সাথে মানুষের জীবন আর পুরো পৃথিবী সম্পর্কেও নিজেকে ভীষণ কৌতূহলী করে গড়ে তুলেছিলাম।

সৌভাগ্যবশত, এই সময়টাতেই আমি প্রাচীন স্প্যানিশ ভূ-খণ্ড এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল এমন সব এলাকায় ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে গেলাম। ভ্রমণকাহিনি লেখার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার পরও, ভ্রমণের আনন্দ পাওয়া যাবে কেবল এটি ভেবেই আমি প্রস্তাবটি লুফে নিলাম। আর এভাবেই লেখালেখির অন্যান্য ধারাগুলোতেও আমার বিচরণ শুরু হয়ে গেল।

আমার ধারণা ছিল যে নিবেদিত প্রাণ লেখকদের জন্য ভ্রমণ কাহিনি লেখাটা একটা চমৎকার অবকাশের মতো। কিন্তু যেসব লেখকের ভ্রমণ কাহিনি পড়ে এই ধারণাটা আমি আত্মস্থ করেছিলাম তারা সকলেই ছিল শহুরে জীবনের মানুষ। যেমন—হাক্সলি, লরেন্স, ওয়াহ্। আমি ব্যক্তিগতভাবে এদের মতো নই। এরা সবাই লিখেছেন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনামলে। বাড়িতে তাদের চরিত্র যেমনই থাকুক না কেন, ভ্রমণের সময় তারা আধা ঔপনিবেশিক হয়ে গিয়েছিলেন। ভ্রমণের সময় ঘটমান দুর্ঘটনাগুলো তারা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে তাদের শহুরে ব্যক্তিত্বের উন্নাসিক মেজাজ বিদেশের পটভূমিকায় অক্ষুণ্ন থাকে।

আমার ভ্রমণটা তাদের মতো ছিল না। আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম নতুন পৃথিবীর আবাদি এলাকায়। আমি নিজেও ওরকমই একটা জায়গায় বড় হয়েছি। নতুন পৃথিবীর রোমান্টিক আবহাওয়ার ভেতর লুণ্ঠিত কোনো দেশের পরিত্যক্ত সমাজব্যবস্থাকে একজন দর্শনার্থীর চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে আমি যেন আমার নিজের ছেলেবেলার সমাজটাকেই একটু দূর থেকে দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা ঠিক উপন্যাসের আরেকটি উপাদান খুঁজে পাবার মতো। নিজের বর্তমান পরিস্থিতি আর নিজেকে ভুলে গিয়ে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ছোটবেলার সেই চিরপরিচিত সমাজব্যবস্থাকে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি যারপরনাই পুলকিত হলাম। ঔপনিবেশিক পরিবেশের ভেতর মানুষের জন্ম ও বেড়ে ওঠার চিত্র আমাকে সমৃদ্ধ করল। ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে আমি বহুদিন আগের ঘটে যাওয়া পরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো নতুনভাবে মনের পর্দায় দেখতে পেলাম।

BanglaBook.org

লিখতে বসে, ভ্রমণকাহিনি লেখার কাঠামো নিয়ে আমি সমস্যায় পড়ে গেলাম। বই লেখার উদ্দেশ্যে কীভাবে ভ্রমণ করতে হয় তা আমার জানা ছিল না। ছুটি কাটাতে আসা মানুষের মতোই আনন্দ উল্লাস নিয়ে ভ্রমণ শেষ করলাম। তারপর একদিন লিখতে বসে বর্ণনামূলক লেখার কাঠামো নিয়ে ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। ভ্রমণ কাহিনির লেখক হিসেবে 'আমি' সর্বনাম কীভাবে ব্যবহার করব তাই নিয়ে ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। একবার মনে হলো যে বর্ণনাকারী লেখক নিজেই ভ্রমণকারী হওয়াতে তার ক্ষমতা অসীম এবং তাকেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিচার বিবেচনা করতে হবে। আবার মনে হলো ভাবনাটা সঠিক হচ্ছে না।

যা হোক, যাবতীয় ভুল-ভাল সত্ত্বেও, প্রথম দিককার লেখা উপন্যাসগুলোর মতোই, এই বইটাও আমার জ্ঞান আর অনুভূতি বৃদ্ধির কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বইটা লিখতে গিয়ে যা কিছু শিখেছি তা আর কখনো ভুলিনি। ফিকশন হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান পরিস্থিতিকে আবিষ্কারের পথ। এটি আমাকে এই পথে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাড়তি হিসেবে পাওয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও আমাকে সমৃদ্ধ করে আরও সামনে পৌঁছে দিয়েছে।

৬

ঘটনাক্রমে আরও একবার নন-ফিকশন বই লেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রকাশক ভ্রমণকাহিনির একটা সিরিজ বের করছিলেন। তিনি আমাকে ঔপনিবেশিক কলোনির উপর কিছু লেখা পাঠাতে অনুরোধ করলেন প্রথমে কাজটাকে খুবই সহজ মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম স্থানীয় এলাকার ছোটখাটো বর্ণনা, কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিময় মুহূর্তের বর্ণনাসহ কাব্যিক কিছু ছবি ফুটিয়ে তুললেই লেখা হয়ে যাবে। এক ধরনের অদ্ভুত সরলতার কারণেই ভেবেছিলাম যে পৃথিবীর সমস্ত সংরক্ষিত জ্ঞানই সহজলভ্য, মানবজাতির সমস্ত ইতিহাস কোথাও না কোথাও সংরক্ষিত আছে, প্রয়োজন পড়লেই সেগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। অনেক চেষ্টা করেও ঔপনিবেশিক কলোনির স্থানীয় এমন কোনো ইতিহাস খুঁজে পেলাম না যা পর্যালোচনা করে লেখা সম্ভব। পাওয়ার মধ্যে পাওয়া গেল কিছু গাইড বই যেখানে কয়েকটি কিংবদন্তিতুল্য কাহিনির একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটায় ইতিহাসের বর্ণনা খুবই হাস্যকর। উদাহরণস্বরূপ একটি বইয়ে বলা হয়েছে ১৫৯৫ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্যার ওয়াল্টার রেলেইগের আগমনের পর এসব এলাকায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি!

BanglaBook.org

শেষমেশ রেকর্ড বিভাগে খোঁজ নিতে গেলাম। এখানে পর্যটকদের রিপোর্ট পাওয়া গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কিছু প্রশাসনিক কাগজপত্রও খুঁজে পেলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খুঁজে পেতে ঔপনিবেশিক কলোনি সম্পর্কিত স্প্যানিশ লেখ্যপ্রমাণের সংকলন বের করলাম। ১৮৯০ সালে ব্রিটিশ গায়েনা এবং ভেনিজুয়েলার সীমান্ত সংঘাতের সময়কালে ইংরেজ সরকার এসব বিবরণ স্পেনীয় দলিল দস্তাবেজের মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার করেছিল।

কিন্তু এগুলোতে আমি সন্তুষ্ট হলাম না। আমার উদ্দেশ্য ছিল ঐ এলাকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন গল্প সম্পর্কে জেনে তা নিয়ে লেখা সাজানো। বস্তুত লেখার উপাদানগুলোকে সুন্দরভাবে সাজানোর এই একটি উপায়ই আমার জানা ছিল। এভাবে লেখা সাজানোটা বেশ জটিল একটা কাজ। নথিপত্র ঘেঁটে পাঁচ ছয় প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন দলিল দস্তাবেজ নিরূপণ করে হয়ত এক প্যারা লেখা যেত। এভাবে যে বই কয়েক মাসের মধ্যে লিখে ফেলতে পারব ভেবেছিলাম তা শেষ করতে আমার পাক্কা দু'বছর লেগে গেল।

নথিপত্র ঘেঁটে লিখতে গিয়ে আমাকে পুরনো ইতিহাস নতুন করে আবিষ্কার করতে হলো। লেখার জন্য গবেষণা করতে গিয়ে আমি খুঁজে পেলাম সাগর আর নদী চষে ফেলা আদিবাসী মানুষদের যারা নিজেদের জীবনজীবিকা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। গত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার জন্য যে সব দক্ষতা প্রয়োজন তার সবই তাদের নখদর্পণে ছিল। কিন্তু নবাগত মানুষের আধুনিকতার সামনে তারা ছিল একেবারেই অসহায়। এর সুযোগ নিয়ে পরবর্তী দুশো বছরে আধুনিক মানুষেরা এই আদিবাসীদের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন করে দেয়। এসময়টাতে আদিবাসীদেরকে মাদক, মিশনারিদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর মৃত্যুর সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে। মানুষের তৈরি আধুনিক বন্য জীবনের হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত এইসব মানুষগুলোকে এরপর দাস বানানো হয়েছে, তাদের রক্তাক্ত করে ফসল আবাদের জমি গড়ে তোলা হয়েছে। আর এভাবেই আঠারো শতকের শেষ ভাগে এখানে স্পেনীয়দের নব্য শহরের সূচনা ঘটে।

স্কুলে আমাদেরকে যে ইতিহাস পড়তে হয়েছে সেখানে দাসপ্রথাকে শুধুই একটি শব্দ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একদিন স্কুলের উঠানে ওয়ার্ম স্যারের ক্লাসে এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা হবার পর আমি মনে মনে দাসপ্রথার একটি অর্থ দাঁড় করিয়েছিলাম। শহরের উত্তর প্রান্তের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আমি নিজে নিজেই ভেবে নিয়েছিলাম যে একসময় ঐ পাহাড়গুলোর দিকে আমার মতোই কিছু মানুষ তাকিয়ে থাকত। সেই মানুষগুলো ছিল পরাধীন। স্বাধীনতা বলতে তাদের কিছু ছিল না, এটা চিন্তা করতেও তখন আমার খুব কষ্ট লাগত।

এবার এই নথিপত্রগুলো বহু বছর আগে স্কুল চত্বরে দাঁড়িয়ে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তাকে বাস্তবে রূপ দিল দাস যুগের ফসল আবাদি এলাকায়

BanglaBook.org

পরিশ্রমরত পরাধীন মানুষগুলোর জীবন চিত্র এবার আমার সামনে একেবারে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। আমার স্কুলের খুব কাছেই এমন একটি আবাদি এলাকা ছিল। ওখানকার একটা রাস্তা ওই এলাকার ব্রিটিশ বংশভূত ফরাসি মালিকের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। সেই আঠারো শতক থেকে আজ পর্যন্ত রাস্তাটা ঐ নামেই পরিচিত নথিপত্রগুলোতে প্রায়ই শহরের কারাগারের বর্ণনা পেতাম। ঐ কারগারের ফরাসি দাসপ্রধান এবং তার দাস সহকারীর প্রধান কাজ ছিল নানা উপায়ে বন্দী দাস-দাসীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। কারাগারের কিছু বিশেষ কুঠুরির কথা জেনে আমি শিউরে উঠতে বাধ্য হলাম। ছাদের ঠিক নিচে এই কুঠুরিগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে তা সারাক্ষণই আগুনের মতো গরম থাকে। জাদুবিদ্যা ব্যবহার করার অপরাধে সন্দেহভাজন দাসদের এখানে আটকে রাখা হতো।

দলিলগুলো থেকে আমি এক অস্বাভাবিক খুনের মামলা সম্পর্কে জানতে পারলাম। মামলাটি, কোনো এক স্বাধীন শ্বেতাঙ্গ মহিলার প্রেমে পাগল হয়ে এক কালো দাস অন্য এক দাসকে খুন করেছে এই সংক্রান্ত। এই ঘটনা থেকে আমি ১৭৯০ সালের শহরের রাস্তায় দাসদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেলাম। সেই সময়কার নগর জীবন, রাস্তাঘাটের মানুষজন সম্পর্কে গবেষণা করে একটা বিষয় বুঝতে পারলাম যে ছেলেবেলায় বহিরাগত হিসেবে বাস করে আমি যে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছি তার সাথে দেড়শো বছর আগের সমাজ ব্যবস্থার তেমন কোনো পার্থক্য নেই। নতুন এই শহরের পুরাতন পথঘাট, জনজীবনের ইতিহাস জানতে পারাটা আমার জন্য বিরল এক অভিজ্ঞতা। দলিলপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঔপনিবেশিক কলোনির ইতিহাস সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমি অর্জন করলাম তার কাছে এ সম্পর্কিত আমার আগের জ্ঞানকে অতি সাধারণ, অগোছালো আর অপ্রয়োজনীয় অতীত স্মৃতি বলে মনে হলো। স্কুল চত্বরের শামান গাছের নিচে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ওয়র্ম স্যারের ক্লাসের জন্য আমরা অপেক্ষা করতাম, কে বলতে পারে হয়ত সেখানেই ১৮০৩ সালে ডমিনিক ভার্টের বেল এয়ার নামক জমিদারি ছিল। কে বলতে পারে, হয়ত ওখানেই দাসদের দলপতি তার মনিবের প্রতি অস্বাভাবিক ভালোবাসা প্রমাণের জন্য অন্য দাসদের বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।

দাসদের ইতিহাসের চেয়েও আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছিল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আদিবাসীদের কাহিনি। এই দেশ তো আসলে আদিবাসীদেরই, তাদের আত্মারাই তো আমাদের ঘিরে আছে। যে মফস্বল শহরে আমার জন্ম অথবা আখের ক্ষেতের মাঝখানের যে এক টুকরো ফাঁকা মাঠে *রামলীলা* দেখেছি, আদিবাসীরাই সেগুলোর নামকরণ করেছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দলিলপত্র নিয়ে গবেষণা করার এক পর্যায়ে আমি একটি চিঠির খোঁজ পাই ১৬২৫ সালে স্পেনের

Banglabook.org

রাজা চিঠিটা দ্বীপের তৎকালীন গভর্নরকে লিখেছিলেন। চিঠি থেকে জানা যায় শহরের আদি নামটি আসলে ওখানে বসবাসকারী আদিবাসীদের এক ছোট্ট গোষ্ঠীর নামানুসারে ছিল। ১৬১৭ সালে এই গোষ্ঠীর লোকজন ইংরেজ আক্রমণকারীদেরকে নদীপথে স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে এগুতে সাহায্য করেছিল। আট বছর পর স্পেনের শাসকেরা এই ঘটনার প্রতিশোধ নেয় স্পেনের গভর্নরের নেতৃত্বে একদল স্প্যানিশ সেই গোষ্ঠীটির ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বিচারে তাদের কঠিনতর শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তিটা কী ছিল সে সম্বন্ধে চিঠিতে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা না হলেও, সেটা যে ভয়ানক কিছু ছিল তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। কারণ শাস্তি দেবার পর ঐ গোষ্ঠীর কাউকে আর ঐ অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি পুরনো নথিপত্র রাখার রেকর্ড বিভাগ থেকেও প্রচণ্ড আক্রোশে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়

এই কাহিনি আমাকে আদিবাসীদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখাল। ছেলেবেলায় দেখা *রামলীলা* কে আমি কিছুতেই আর জীবনের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে ভাবতে পারছিলাম না। *রামলীলা*'র সেই মাঠে অন্য একদল আদিবাসী মানুষ আমার কল্পনার ভেতরে ঘোরাফেরা শুরু করে দিল। এর আগে কেবল মাত্র গল্প-উপন্যাস লেখার অভিজ্ঞতা দিয়ে এত বড় সত্যকে আমি কখনোই এভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি।

কেবলমাত্র নথিপত্র ঘেঁটে সম্পূর্ণ একটি বই লেখার এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই বইটি লিখতে গিয়েই আমি কীভাবে বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কাহিনি বা ঘটনাবলিকে মানবিক উপায়ে বর্ণনা করা যায় তা শিখলাম এই কষ্টার্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা আমাকে পরবর্তী ত্রিশ বছর যাবৎ আরও অনেকগুলো ভ্রমণ কাহিনি বা গবেষণামূলক রচনায় সাহায্য করেছে। এভাবেই আমার ভাবনার জগৎ প্রসারিত হলো সেই সাথে আমার উপন্যাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও বিস্তৃতি লাভ করল জ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে লেখার যে সব ধারা আমি চর্চা শুরু করেছিলাম সেগুলোও একইভাবে আরও বিকশিত হলো। যেহেতু লেখার গঠন মূলত নির্ভর করে বিষয়বস্তু বা উপাদানের উপর তাই আমার কোন ধারার লেখা বিশেষভাবে উন্নত হলো সেটা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না সব বই-ই আমার অনুধাবন ক্ষমতার একটি অংশ লেখালেখি পেশাটাই আমাকে এই অনুধাবন ক্ষমতা লাভে উজ্জীবিত করেছে। ছেলেবেলায় লেখক হবার যে ইচ্ছা ছিল নিতান্তই ছেলেমানুষী পর্যায়ের একটা শখ সেটিই মূলত পরে গল্পের পর গল্প তৈরি করতে আমাকে মরিয়া করে তুলল।

উপন্যাসের ধারাটা আমার নিজস্ব সৃষ্টি নয় এটি অন্যদের কাছ থেকে এসেছে। বিখ্যাত শহুরে লেখকদের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো স্বঅর্জিত জ্ঞানের একটি কাঠামো যার সাথে অন্যান্য নিয়ম কানুন, কল্পনা নির্ভর নানা সাহিত্যধারা আর

BanglaBook.org

শিক্ষণীয় ব্যাপারস্যাপার সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে শুরুর দিকে স্বঅর্জিত জ্ঞানবিহীন উপন্যাসই ছিল একমাত্র সম্বল। শহুরে লেখকদের যা ছিল আমার তা অবশ্যই ছিল না। আমি যে সমাজে বড় হয়েছি সেখানকার অনেকেরই গোষ্ঠীগতভাবে অতীত সামাজিক জীবনের জ্ঞান বলতে দাদার আমল পর্যন্ত জানা ছিল। এর বেশি পেছনের ইতিহাস আমরা জানতাম না। অন্যদিকে হাস্যকর সব স্থানীয় গাইড বইগুলোতে বলা হয়েছে দাস যুগের ফসল আবাদি জায়গাগুলোতে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি! ফলে চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সমাজের লেখকেরা যে গল্প উপন্যাস লিখেছে সেগুলো হয়ে গেছে ভিত্তিহীন, অন্তঃসারশূন্য এবং প্রসঙ্গ বহির্ভূত। আর এ কারণেই শহুরে লেখকদের উপন্যাসে স্বঅর্জিত জ্ঞানের যে মাধুরী মেশানো থাকে আমার উপন্যাসে তা একবারেই ছিল না।

ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্যবই আর পাঠাগারের গল্পের বইগুলো পড়তে গিয়ে দুটো ভিন্ন জগৎ আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। এর মধ্যে একটি জগৎ হলো একদম ছেলেবেলার জগৎ যেখানে ভারতবর্ষ থেকে আগত মানুষেরা তাদের স্মৃতি থেকে এমন এক সমাজ গড়ে তুলেছে যা ভারতের প্রতিচ্ছবি এঁকে দেয়। আরেকটি জগৎ হলো দ্বীপের ঔপনিবেশিক শহুরে সমাজ। তবে আমার ধারণা ছিল যে ছোটবেলায় অনুভূত সামাজিক এবং মানসিক অস্বস্তির কারণেই বই পড়ে বোঝাটা আমার জন্য কঠিন ছিল। ছেলেবেলার সেই পরিচিত অনুভূতি (কাহিনি শুরু হয়ে যাবার পরে সিনেমা হলে ঢুকে সিনেমার কাহিনি বুঝতে না পারা) এই সমস্যার জন্য দায়ী। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে বয়সের সাথে সাথে এই অস্বস্তিটুকুও চলে যাবে। প্রথম দিককার লেখা উপন্যাসগুলোতে আমি কেবল গল্পের শুরু, শেষ, চরিত্র গঠন আর হাস্যরসের কাঠামো এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে সত্যটাকে ধরতে পারিনি। কিন্তু লেখালেখি চালিয়ে যেতে গিয়ে ধীরে ধীরে সত্যটা আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেই সত্যটা হচ্ছে, নিজের শৈশবের দুই অজানা জগতের অন্ধকার বলয়ই আমার লেখালেখির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ফিকশন এক রহস্যময় পদ্ধতিতে কাজ করে আমাকে এক অজানা পথের দিশা খুঁজে দিয়েছে যেখানে আমার লেখার বিষয়বস্তুগুলো থরে থরে সাজানো। কিন্তু এই পদ্ধতি যে আমাকে সারা জীবন পথ দেখাতে পারবে না—এই উপলব্ধিটুকুও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখক এবং ভারত

১

ভারতবর্ষ যেন এক বিশাল ক্ষত। পুরো ভারত দেশটাই লেখার জন্য চমকপ্রদ একটি বিষয়। আবার এই দেশেরই করুণ দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমাদের দাদা-পরদাদারা প্রবাসে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে সেটা আজকের কথা নয় সেটি ঊনবিংশ শতকের শেষ দিককার কাহিনি। ঐ সময়কার ভারতের দুটি রূপ ছিল যারা পরস্পরের থেকে পৃথক। এর মধ্যে একটি হলো ভারতের রাজনৈতিক রূপ যেটি তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সুখ্যাত। অন্যদিকে ভারতের আরেকটি রূপ যা মূলত নিজস্ব অস্তিত্ব নির্ভর, সেটির অবস্থান ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। স্মৃতি ক্রমশ মলিন হওয়ার সাথে সাথে ভারতের দ্বিতীয় ওই রূপটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতের এই রূপ কোনো সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। কিপলিং, ই.এম ফরস্টার অথবা সমারসেট মমের লেখায় যে ভারত আমরা দেখি তার সাথে এই ভারতের কোনো মিল নেই। আবার নেহরু এবং রবীন্দ্রনাথের জাঁকজমকপূর্ণ ভারতেও এই রূপের খোঁজ মেলে না। (প্রেমচাঁদ [১৮৮০-১৯৩৬] নামে এক ভারতীয় লেখকের হিন্দি এবং উর্দু ভাষায় লেখা গল্পে আমাদের সেই চির পরিচিত ব্যক্তিগত ভারতের গ্রাম্য জীবনের অতীত রূপটি ফুটে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু এই লেখকের লেখার সাথে আমাদের পরিচয় ছিল না; এ ধরনের লেখা পড়ার মতো মানসিকতাও আমাদের ছিল না।)

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার সুখ্যাত ভারত আমায় টানেনি। পরবর্তীতে, যখন সময় এল তখন, আমি ভারতের এই নিজস্ব সত্তার দিকে ফিরে তাকালাম। অবশ্যই সত্যকে দেখতে পারার মতো যথেষ্ট মানসিক শক্তি আমার ছিল। তারপরও ভারতের নিজস্ব ব্যক্তিগত সত্তাকে ভালোভাবে অবলোকন করতে যেয়ে আমি শিউরে উঠলাম। ভারতের ভয়াবহ রকমের ক্ষত বিক্ষত যে জীবন আমি দেখতে পেলাম সেটির জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনোই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার পরিচিত আর কোনো দেশকেই প্রত্যেক পরতে পরতে এতটা দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি আর ভারতের মতো এত বিরাট জনসংখ্যাও খুব কম দেশেরই ছিল। ভারতকে পর্যবেক্ষণ করতে যেয়ে মনে হলো আমি যেন পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক মহাদেশে এসে পড়েছি। এবং সেই মহাদেশটি

BanglaBook.org

রহস্যময় বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত। এত কিছুর পরও ভারতের এই প্রতিচ্ছবির মূলভাগে আমি এমন কিছু খুঁজে পেলাম যা আমাকে অভিভূত করে দিল। আমার পরিচিত আধুনিক কালের ভারতীয় বা ইংরেজি সাহিত্যে এই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে না। কিপলিঙের লেখা একটি ইংরেজি রোমান্সের পটভূমিতে ভারতের মহামারীর প্রসঙ্গ এসেছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সকল ধরনের ইংরেজি এবং ভারতীয় সাহিত্যে ভারতের দুঃখ-দুর্দশার কথা সাধারণত এমনভাবে এসেছে যেন তা চিরস্থায়ী; ভারতের সেই দুর্দশা অচ্ছুত্যের মতন কেবল নেপথ্যে থাকারই যোগ্য। আর বরাবরের মতোই কিছু লেখক আছে যারা ভারতের বিশেষ বিশেষ দুর্যোগ দুর্দশার ভেতর অনবরত এক ধরনের আধ্যাত্মিক সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করে গেছেন।

কেবল গান্ধীর আত্মজীবনী, *দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ*-এর কয়েকটি অধ্যায়ে ১৮৯০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত অসহায় ভারতীয় শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার সংক্ষিপ্ত ছবি ফুটে উঠেছে। এবং সেখানেই (পরোক্ষভাবে হলেও) আমি আমার পরিচিত ভারতের আঘাতগুলোর নগ্ন বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পেয়েছিলাম।

ভারতের এই রূপকে নিয়ে আমি একটি বই লিখেছিলাম। তারপর এ বিষয়ে আর লেখা না হয়ে উঠলেও ঐ আঘাতের প্রতিচ্ছবি আমি কখনো ভুলতে পারিনি। ভারতের ঐ বিনষ্ট রূপকে অতিক্রম করে অন্য ভারতের ছবি আবিষ্কার করতে আমার আরও অনেক সময়, আরও অনেক মানসিক অবস্থা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। বলা যায় ভারতের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয় রাজনৈতিক ধারণার প্রচলিত প্রবণতা এবং দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে আমার বেশ সময় লেগেছে। ভারতীয় সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রেই দুর্দশার প্রমাণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রাম আর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশরা ভারতের এ দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির দিকে তেমন একটা নজর দিতে পারেনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও ভারতীয়দের এ দুর্দশার বিষয়ে অন্ধ ছিল। ধর্মের মতোই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একরোখা; তার অপছন্দের বিষয়গুলো থেকে সে ঠিকই মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল।

১০০০ খ্রিষ্টাব্দের ছয়শো বছর পরে মুসলিমরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তছনছ করে দেয়। রাজত্ব আর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পরও তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধবাজ এই মুসলিমরা ভারতবর্ষের উত্তর দিকের ধর্মীয় মন্দিরগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়; দক্ষিণের অনেক গভীর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তারা সেখানকার মন্দিরগুলোও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে

বিংশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে অতীতের ঐ সব শতকের পরাজয় বড্ড অস্বস্তিকর তাই, ইতিহাসকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হলো। ফলে ব্রিটিশদের পূর্ববর্তী শাসক এবং শাসিত, বিজয়ী এবং প্রজা, বিশ্বাসী এবং

BanglaBook.org

অবিশ্বাসী, সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। ব্রিটিশ শাসনের বিরাট সাম্রাজ্যের কাছে এই একীভূত ইতিহাসের কিছুটা গুরুত্ব ছিল বৈকি। তারপরও ব্রিটিশদের সামনে ভারতের সমগ্র ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে চাইলে জাতীয়তাবাদী লেখকদের সামনে একটাই সহজ পথ খোলা ছিল। সেটি হলো পঞ্চম এবং সপ্তম শতকের প্রাক-ইসলামী যুগে ফিরে যাওয়া যখন কিছু সংখ্যক জাতির জন্য ভারত ছিল পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র। বলে রাখা ভালো, ঠিক এ সময়টাতেই অর্থাৎ প্রাক-ইসলামী যুগেই চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং জ্ঞানী গুণীরা ভারতের বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে তীর্থ যাত্রায় আসতেন।

চৌদ্দ শতকে মরক্কোর মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক এবং পর্যটক ইবনে বতুতাকেও ভারতের সামগ্রিকতার ধারণা স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য কম কষ্ট করতে হয়নি। ইবনে বতুতার ইচ্ছা ছিল মুসলিম বিশ্বের সবকটি দেশ ভ্রমণ করা। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই মুসলিম শাসকদের উদার ছত্রছায়ায় দিনানিপাত করেছেন আর বিনিময়ে তাদেরকে দিয়েছেন আরবদের খাঁটি ধর্মানুরাগ।

বতুতা যখন ভারতে আসেন তখন ভারত মুসলিমদের অধিকৃত ভূমি। ভারতের তখনকার শাসকদের কাছ থেকে তিনি পাঁচটি গ্রামের সমস্ত রাজস্ব (বা শস্য) উপহার পান। এমনকি সেবার দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তার উপহার সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচ থেকে সাতটি গ্রাম করা হয়। বতুতা ভারতে সাত বছর থাকার পর পালিয়ে বাঁচেন। তার সর্বশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দিল্লির শাসক। এই শাসক ছিলেন মারাত্মক রক্তলোভী। বিচারের নামে ফাঁসির আদেশ আর অত্যাচারের নির্দেশ দেওয়াই ছিল তার দরবারের প্রাত্যহিক নিয়ম। নির্দয় এই শাসকের নির্দেশে ফাঁসিতে লটকানো মৃতদেহগুলো কমপক্ষে তিনদিন জনসম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হতো। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম স্বৈরশাসকদের শাসন দেখে অভ্যস্ত ইবনে বতুতা পর্যন্ত তাঁর ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকের এহেন নিষ্ঠুরতায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। দিল্লির সম্রাট যখন তাকে নজরবন্দি রাখার জন্য চারজন সেপাই নিয়োজিত করলেন তখন বতুতা ভাবলেন তার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে সম্রাট এবং তার সভাসদদের কাছে এটা ওটা নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ করতেন বতুতা। তাঁর ভাষ্য ছিল যে সম্রাটের দেওয়া উপহারসমূহ তাঁর কাছে পৌছানোর আগেই কতিপয় সভাসদেরা সেগুলো হাপিস করে ফেলে। কিন্তু, পরে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বতুতা ভয় পেয়ে ঘোষণা দিলেন যে, সভাসদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি অনুতপ্ত। তিনি টানা পাঁচ দিন রোজা রাখলেন, উপবাসের সময় সারাদিন কোরান তেলোয়াত করলেন। অবশেষে ভিক্ষুকের বেশে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হলেন। ধর্মতাত্ত্বিকের এই অনুতপ্ত ভাব দেখে সম্রাটের পাথর হৃদয়ও গলে গেল। ফলে ইবনে বতুতাকে নজরদারি থেকে মুক্তি দেওয়া হলো।

BanglaBook.org

অস্পষ্টভাবে হলেও এই ইবনে বতুতার বর্ণনাতেই কেবল প্রচীন ভারতের সাধারণ জনতার জীবনের গল্প পাওয়া যায়। যাদের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তারা ছিল হয় তাঁর ভূমিদাস অথবা ক্রীতদাস (শাসকের কাছ থেকে পাওয়া উপহারের ভেতর এইসব দাসেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল)। ইবনে বতুতা ক্রীতদাসীদের নিয়ে ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন। এইসব দাস-দাসীদের ধর্ম বিশ্বাস বতুতার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগত। শুধু এটুকু ছাড়া তাদের নিয়ে আর তেমন কোনো মানবিক অনুভূতি তাঁর হতো না। দিল্লির শাসকেরা ঐ সব দাস-সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজার ধর্মীয় রীতিগুলো আক্ষরিক অর্থেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। স্থানীয় লোকজন তাদের ভূমির মালিকানা হারিয়েছিল আর বিদেশি শাসকদের কাছে দেশটির কোনো পবিত্রতা ছিল না।

বতুতার বর্ণনা থেকে ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত চিত্রের শুরুর দিকটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সপ্তদশ শতকের ইয়োরোপীয় পর্যটকদের ভেতর থমাস রো এবং বারনিয়ের ভারত ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা সেসময় নিজের চোখে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখেছিলেন। সেসময়কার ভারত সম্পর্কে তাঁদের বর্ণনাগুলো প্রকারান্তরে তখনকার ভারতীয় শাসকদের প্রতাপশালী ভূমিকাকে নানা মাত্রায় কটাক্ষ করে। তাঁদের বর্ণনা থেকেই আমরা জানতে পারি যে মুঘলদের আলিশান প্রাসাদের বাইরের জনতা বাস করত ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়েঘরে। উইলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেলের লেখা ভ্রমণ কাহিনিতেও সাধারণ মানুষের এই জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯ সালে টাইমস পত্রিকায় ভারতের বিপ্লবের উপর লিখেছিলেন রাসেল। কলকাতা থেকে পাঞ্জাবের পথে ভ্রমণ করার সময় ভারতের সাধারণ মানুষের দুর্দশার চিত্র তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তার মতে ভারতের সবখানেই পুরনো ধ্বংসস্তূপ। সাধারণ মানুষগুলো পেট ভরে খেতে পায় না। হাড় জিরজিরে দুর্বল শরীর নিয়ে তারা, ব্রিটিশদের আগে আসা অন্য সব শাসকদের জন্য যেভাবে খেটেছিল সেভাবেই ব্রিটিশ শাসকদের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

প্রকাশ করার ভাষা জানা না থাকলেও ছোটবেলা থেকেই আমি ভারতের সামগ্রিকতায় বিশ্বাস করতাম। ত্রিনিদাদে আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরটির বাইরের খোলা মাঠে *রামায়ণ*'র গল্প নিয়ে যে *রামলীলা* পালা হতো সেটাও এই সামগ্রিকতারই একটি অংশ। আমাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আর পারিবারিক ব্যক্তিগত ছোটখাটো উৎসব-পরব সবই সামগ্রিক ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভারতকেই আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, ভুলে গেছি—অতীত সম্পর্কে নতুন করে অনুধাবন করলাম আমি। এই উপলব্ধিটুকু হতে বছরের পর বছর সময় লেগে গিয়েছিল। তবে এই অনুধাবন শক্তিই আমার সামনে প্রাচীন ভারতের রোমান্সকে প্রকাশ্য করে তুলল। দেখাল কীভাবে আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরের ভারতীয়

BanglaBook.org

সমাজ তার প্রাচীন সভ্যতার প্রতি নানা উৎসবের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। ওই প্রাচীন সভ্যতা আমাদের কাছে ছিল অবিনশ্বর। এই অবিনশ্বরতার ভাবনা থেকেই আমি বুঝতে পারলাম যে স্প্যানিয়ার্ডদের সামনে মেক্সিকান এবং পেরুভিয়ানরা যেমন অসহায় ছিল মুসলিম আক্রমণকারীদের সামনেও আমাদের সভ্যতা ঠিক একইরকম ছিল। আক্রমণকারীদের ঐ সব সভ্যতার প্রায় অর্ধেক যেভাবে খান খান হয়ে গিয়েছিল ভারতের সভ্যতাও মুসলমানদের হাতে সেভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

২

প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা থাকে। কিন্তু আমি বুঝতাম না যে, ভারত নিয়ে ঠিক কী ধরনের উপন্যাস লেখা যায়। উপন্যাস সবসময় নৈতিক বা সাংস্কৃতিক গণ্ডির ভেতরেই সবচেয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। ঐ গণ্ডির নিয়মগুলো সাধারণত লেখকের জানা থাকে ফলে নিজস্ব গণ্ডির ভেতরের আবেগ, অনুভূতি আর নৈতিক ভীতি নিয়ে উপন্যাস তার নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে যায়। সাহিত্যের অন্য ধারাগুলোতে এসব বিষয়ের উপস্থিতি মোটামুটি অধরা বা অসম্পূর্ণই বলা চলে।

ভারত সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তা খুবই সুস্পষ্ট। ঐ অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস লিখতে হলে আমাকে যা করতে হতো তা হলো—আমাকে আমার নিজের মতোই একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে হতো যার অতীত জীবন এবং পূর্বপুরুষদের সাথে আমার অতীতের মিল আছে। ঐ চরিত্রটিকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কী কী ঘটনা ঘটতে পারত তা আমাকে অনুমান করে নিতে হতো। ব্যাস এভাবে আমার অভিজ্ঞতাকে কম বেশি এদিক সেদিক করেই আমি উপন্যাসটি দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু এতে করে উপন্যাসটিতে বাড়তি কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতাই যোগ করা হতো না। টলস্টয় পর্যন্ত পাঠকের সামনে খানিকটা বাড়তি বাস্তবতা তুলে ধরার প্রয়াসে উপন্যাসের সাহায্য নিয়েছিলেন। আর এভাবেই সেবাস্ত পোল নগর দখলের ঘটনা খুব কাছ থেকে তিনি উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন এ থেকেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, প্রয়োজনীয় সব কিছু খুঁজে বের করে ভারতকে বিষয়বস্তু বানিয়ে কোনো উপন্যাস লিখতে গেলে তা হতো বাড়তি বাস্ত বতাবিহীন একটা কিছু যেখানে আমার অমূল্য অভিজ্ঞতায় আমি হয়ত শেষ পর্যন্ত মিথ্যার ছাপ ফেলে দিতাম। আমার অভিজ্ঞতার মূল্য লুকিয়ে আছে এর স্বকীয়তায়। তাই ভেবে দেখলাম যে, যতটা সম্ভব বিশ্বস্ততার সাথে এই অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করাটাই আমার একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত।

শহর কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো অনুকরণ করা যতই সহজ হোক না কেন ওসব সাহিত্যে সমাজকে শহরকেন্দ্রিক ধ্যান ধারণাসহই উপস্থাপন করা হয়েছে।

BanglaBook.org

শহরকেন্দ্রিক উপন্যাসের সমাজে তাই ব্যাপক শিক্ষার ছড়াছড়ি, ইতিহাসের ধারণা আর আত্মজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতার ভাব সুস্পষ্ট। যে সমাজে ঐ সব ধ্যান ধারণা ভুল, যেখানে ব্যাপক শিক্ষার সুযোগ ক্রুটিপূর্ণ অথবা অনুপস্থিত, সেসব সমাজ সম্পর্কে শহর কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো অল্প কিছু বাহ্যিক বিষয় ছাড়া আর কোনো গভীর চিন্তা তুলে ধরতে পারে কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। জাপানিরা নিজেদের সমৃদ্ধ সাহিত্য আর ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সাথে বহির্বিশ্ব থেকে আনা উপন্যাসের ধারাকে যথার্থভাবে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। কিন্তু ভারত তো আর জাপান নয়। ভারতের অতীতের বর্ণনা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, ভারতের ইতিহাস হয় অজানা নয়ত জানা সম্ভব নয় অথবা অস্বীকৃত। সেই ভারতকে নিয়ে লেখার জন্য যদি আমি উপন্যাসকে বেছে নিই তবে তা আংশিক সত্যের চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করতে পারবে কিনা তা আমার জানা ছিল না। এভাবে লেখা উপন্যাস বিরাট অন্ধকারের পথে কোনো জানালা দিয়ে আসা নিভু নিভু আলোর মতোই আবছা পথ দেখাবে কিনা কে জানে!

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে ভারতীয় লেখকদের তেমন কোনো পরিচিতি ছিল না। সে সময়ে আমাদের (আমার ও আমার বাবা) কাছে আর.কে.নারায়ণ ছিলেন এমন এক ভারতীয় লেখক যার লেখা আমাদের উৎসাহ যোগাত। নারায়ণ ভারতীয় জীবন সম্পর্কে ইংরেজিতে লিখেছেন। কাজটাতে অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল নারায়ণ ঐ সব বাধাকে যেন উপেক্ষা করেই লিখে গেছেন। তার লেখার ধরন সোজাসাপ্টা, হালকা। সামাজিক অবস্থার ব্যাখ্যা সেখানে নেই বললেই চলে। নারায়ণের ইংরেজি খুবই সহজ এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতির। তার লেখার এই বৈশিষ্ট্য ইংরেজদের সামাজিক সাহচর্য থেকে অনেক দূরে হলেও সে ভাষা পাঠকের কাছে একটুও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। এর আরেকটি কারণ হতে পারে যে নারায়ণের লেখা সবসময়ই তার নিজস্ব সংস্কৃতির ভেতর থেকে লেখা হয়েছে। তার গল্প জুড়ে রয়েছে দক্ষিণ ভারতের এক ছোট্ট শহরের অধিবাসীরা যারা নিম্নবর্ণের মানুষ হলেও বড় বড় কথা বলতে পটু আর কাজ করে ছোট ছোট। এই কাহিনি দিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন; আর সেই একই কাহিনি তিনি পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরেই লিখে গেছেন। ১৯৬১ সালে নারায়ণের সাথে লন্ডনে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তখন ভারতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নারায়ণ আমাকে বললেন যে তিনি দেশে ফিরে যেতে চান। তিনি আমাকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন যে তার প্রাত্যহিক হাঁটাহাঁটি (রোদ থেকে বাঁচার জন্য একটি ছাতা তার হাতে থাকত) আর তার চরিত্রদের কাছে তাকে ফিরে যেতেই হবে।

BanglaBook.org

নিজের জগতে নারায়ণ নিজেই অধিকর্তা ছিলেন। তার জগৎটা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, কেবল তার আগমনের অপেক্ষাই সেখানে বাকি ছিল। নারায়ণের সেই জগৎটা বহির্বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে এতটাই দূরে যে গোলযোগের শব্দ সেখানে পৌঁছানোর পথেই মারা যায়। এমনকি ঊনবিংশ শতকের ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপও সেই জগৎকে স্পর্শ করতে পারেনি। সেই জগতে ব্রিটিশদের উপস্থিতি বলতে ছিল কেবল রাস্তাঘাট আর দালানকোঠার ব্রিটিশ নামকরণ। নারায়ণের সৃষ্ট ভারত যেন বৃথা গর্ববোধকে ব্যঙ্গ করে নিজের পথেই নিজের মতো চলত।

একের পর এক রাজবংশের উত্থান হয় তারপর পতন ঘটে। প্রাসাদ আর ভবন গড়ে ওঠে আবার অদৃশ্যও হয়ে যায়। পুরো দেশ আক্রমণকারীর তরবারির নিচে জ্বলে ওঠে। আবার সারায়ু'র (স্থানীয় নদী) দুকূল ছাপিয়ে গেলে সে আগুনও নিভে যায়। কিন্তু চিরকালই এর পুনর্জন্ম আর বিস্মৃতি ঘটে।

নারায়ণের এই দৃষ্টিভঙ্গি (যা তার অন্যান্য বই থেকে অধিকতর আধ্যাত্মিক) থেকে দেখা যাচ্ছে যে আগুন আর পরাজয়ের তরবারিকে তিনি কেবল সার সংক্ষেপ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সত্যিকারের কোনো কষ্টের বর্ণনা সেখানে নেই আর পুনর্জন্ম যেন অলৌকিকভাবেই ঘটে। নারায়ণের গল্পে বর্ণিত নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্ত মানুষেরা ছোট ছোট কাজ করে সামান্য পরিমাণ আয় করে। তাদের জীবন জুড়ে আছে তাদের আচার আচরণ যা দিয়ে তারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অদ্ভুত এক উপায়ে এই মানুষেরা ইতিহাসের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা যেন হাওয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তাদের কোনো আদি পুরুষ নেই। নারায়ণের চরিত্রদের কেবল বাবা, খুব বেশি হলে দাদা থাকে; তাদের সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি অতীতের খবর পাওয়া দুষ্কর। চরিত্রগুলো প্রাচীন মন্দিরে ঠিকই যাওয়া আসা করে কিন্তু ঐসব মন্দিরের প্রাচীন নির্মাতাদের ওপর ভরসা করতে পারে না। অন্যদিকে তারা নিজেরাও এমন কিছু তৈরি করতে পারে না যা কালের আঘাতের সামনে টিকে থাকতে পারবে।

কিন্তু, নারায়ণের বর্ণনায় যে দেশকে আমরা দেখি তা পবিত্র এবং সেই দেশের একটি অতীত আছে। উপরে উল্লিখিত তার আধ্যাত্মিক ধরনের উপন্যাসটিতে একটি চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রটি সাধারণ নাটকীয় ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে মনশ্চক্ষে ভারতের অতীতের একটি সাধারণ চিত্র দেখার সৌভাগ্য লাভ করে। এইসব ধারাবাহিকতার প্রথমটি হচ্ছে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বের রামায়ণের একটি চরিত্র, দ্বিতীয়টি ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বের মানুষ বুদ্ধ, তৃতীয়টি নবম শতকের দার্শনিক শঙ্করাচার্য, চতুর্থটি প্রায় এক হাজার বছর পরে ব্রিটিশদের আগমনের সময়কালের একটি চরিত্র। বর্তমান সময়ের স্থানীয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শিলিং সাহেবের মাধ্যমে নারায়ণের গল্পের এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়।

BanglaBook.org

তার তৈরি করা নাটকীয় এই ধারাবাহিকতায় মুসলিম আক্রমণের শতকগুলো এবং মুসলমানদের শাসনামলের সময়কাল খুঁজে পাওয়া যায় না। নারায়ণের ছেলেবেলা কেটেছে মহীশুর রাজ্যে। মহীশুরের একজন হিন্দু মহারাজা ছিলেন। ব্রিটিশরা মহীশুরের মুসলমান শাসককে পরাজিত করার পর ঐ হিন্দু রাজাকে সিংহাসনে বসায়। হিন্দু ঐ মহারাজা এক প্রসিদ্ধ বংশের মানুষ ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিল দক্ষিণের বিখ্যাত হিন্দু রাজত্বের শাসক ১৫৬৫ সালে সেই হিন্দু রাজত্ব মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়। এবং সেই সাথে ধ্বংস হয়ে যায় রাজ্যের জাঁকজমকপূর্ণ রাজধানী (শহরের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী গুণীজনেরাও মারা যান)। কেবল পড়ে থাকে দরিদ্র এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি রাজ্য যার সৃষ্টিশীল মানুষেরা সবাই মৃত জায়গাটি দেখে কে বলবে যে ঐখানে এক সময় এক মহান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল! রাজধানীর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে মহীশুর শহর মাত্র এক দিনের পথ। এখনো সেই ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন বিদ্যমান যা চার শতাব্দী পরেও খুন, লুট, মৃত্যু আর হিন্দুদের পরাজয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তাই নারায়ণের লেখা নিয়ে সর্বোপরি এটাই বলতে হয় যে দেখে যতটা সম্পূর্ণ বলে মনে হয়, তার জগৎ ততটা পরিপূর্ণ নয়। তার সৃষ্টি করা সাধারণ মানুষগুলো অতীত নিয়ে কেবল স্বপ্নই দেখে কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত বংশের পরিচয় সেখানে নেই; তাদের অতীতে একটি বিরাট ফাঁক আছে। যেমনটা ছোট হওয়া উচিত তেমনই ছোট্ট তাদের জীবন ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে তাদের এই ছোট গণ্ডিবদ্ধ জীবনকেই কেবল বের হয়ে আসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতায় সেখানে সামান্য কিছু নতুন কাঠামো যুক্ত হয়েছে মাত্র (উদাহরণস্বরূপ: স্কুল, রাস্তা, ব্যাংক, কোর্ট) নারায়ণের বইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে জ্ঞানী এবং কষ্টসহিষ্ণু হিন্দু ভারতকে কমই খুঁজে পাওয়া যায়। বরং নারায়ণের বইতে ব্রিটিশদের শাসনামলের সেই শান্তিকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যার ক্ষীয়মান ধারা এখনো কিছুটা হলেও রয়ে গেছে।

সুতরাং ইংরেজি বা ইয়োরোপিয়ান উপন্যাস থেকে ধার করা ভারতও মাঝে মাঝে নিজস্ব ধ্যান ধারণার নির্যাসকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হতে পারে এ ধরনের উপন্যাসে বাহ্যিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনটা ভালো হয়ে থাকলেও ভেতরের দিকটা ফাঁকাই রয়ে যায় ঠিক যেমনটা ঘটেছে নারায়ণের বেলায়। উপন্যাসের লেখক হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেই আমার নিজের জগৎটাকে সামান্যই বুঝতে পারতাম। আমাদের পরিবারের অতীত, দেশত্যাগ, প্রায় মলিন হয়ে যাওয়া স্মৃতি থেকে গড়ে তোলা কৌতূহলদ্দীপক ধরনের ভারতীয় পরিবেশ যেখানে আমাদের প্রজন্ম একাধারে বাস করে আসছে, ওয়র্ম স্যারের ক্লাস, বাবার সাহিত্যিক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এগুলো সবই প্রমাণ করে যে, ভারতকে নিয়ে ভাবতে গেলে আমি নিজেও শুধু বাহ্যিক বিষয়গুলোকেই দেখি কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই এই ধারণার

Banglabook.org

বাইরে বের হয়ে আসার জন্য আমাকে নতুন পথ খুঁজে বের করতে হলো। তখন পুরো একটি নতুন জগৎ আমার সামনে অপার বিস্ময় নিয়ে উন্মোচিত হলো আমার আবিষ্কারের জন্য এমন একটি জগৎ অপেক্ষা করে আছে, বলতে গেলে এ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

৩

উনবিংশ শতকের প্রায় ষাট বা সত্তর বছর ধরে ইয়োরোপের দক্ষ সাহিত্যিকদের লেখনীতে ব্যবহৃত হতে হতে উপন্যাস সাহিত্যের এক অসাধারণ মাধ্যমে পরিণত হয়। রচনা, কবিতা, নাটক, ইতিহাস—সাহিত্যের আর কোনো শাখাতেই ঐ সময়ে এত উন্নতি হয়নি। উপন্যাসের কারণেই শিল্প বিপ্লব পরবর্তী আধুনিক সমাজের একটি পরিষ্কার ছবি আমরা পেয়েছি। আর প্রাপ্ত এই ছবির কারণেই সমাজ সম্পর্কে পাঠকের ধারণা অবিলম্বেই পাল্টে যায়। কাঠামোর কিছু কিছু দিক পরবর্তীতে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হলেও আধুনিক উপন্যাসের মূল কাঠামোটি বস্তুত ঐ সময়েই দাঁড়িয়ে যায়। এবং এখনো লেখকেরা কম বেশি সেটাই অনুসরণ করে চলেছে।

আমরা যারা পরবর্তীকালের লেখক, তাদের লেখা মূলত উপন্যাসের তৈরি হয়ে যাওয়া কাঠামো থেকেই উৎপত্তি হয়েছে আমরা আর কখনোই এই ধারার সৃষ্টিকালের লেখক হতে পারব না। হয়ত এই কাঠামোতে আমরা নতুন কিছু সংযোজন করতে পারব কিন্তু মূল কাঠামোটি আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। আর কখনোই আমরা *রবিনসন ক্রুসোর* সমার্থক কিছু লিখতে পারব না। ক্রুসো দ্বীপের ভেতর দাঁড়িয়ে প্রথমবারের মতো বন্দুক ছুড়েছিল, যেটি ঐ জায়গায় সৃষ্টির আদিকাল হতে কেউ কখনো করেনি। ক্রুসোর এই কাজটি করার সুযোগ ভবিষ্যতেও আমরা কখনো আর পাব না। এক্ষেত্রে রূপক ব্যবহার করে বলা যায় যে, উপন্যাসের উদ্ভাবকদের দিকে কান পাতলে আমাদের কেবল তাদের ছোড়া বন্দুকের শব্দেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রথম দিককার ঔপন্যাসিকেরা নিজেরাও জানতেন না যে তারাই এই পথের পথিকৃত কিন্তু আবার একই সময়ে (উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ম্যাকেইয়াভেলি তার *ডিসকোর্স* এবং মনটেইন তার *অ্যাসেইস* লেখার সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে তারাই এই পথের পথিকৃৎ) তারা নিজেদের এই উদ্ভাবনী সম্পর্কে জানতেন। উপন্যাসের উদ্ভাবকেরা নিজেদের আবিষ্কার নিয়ে ভীষণ উত্তেজনাও অনুভব করতেন। ঐ উত্তেজনার অনুভূতিটুকু আমাদের ভেতরেও প্রবাহিত হয়েছে আর লেখার এক অতুলনীয় শক্তিও আমাদের অনুভবেও স্পন্দিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

নিচের দীর্ঘ অংশটি ১৮৩৮ সালে রচিত *নিকোলাস নিকলবির* প্রথম অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে। ডিকেন্স যখন এই উপন্যাসটি লেখেন তখন তিনি মাত্র ছাব্বিশ বছরের এক তরুণ লেখক। বজ, *পিকউইক* এবং *অলিভার টুইস্ট* লেখার পর ডিকেন্স তখন একটি সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তা হলো যে লন্ডন শহরে যা কিছু তিনি নিজের চারপাশে দেখতেন তার সবই নিজের লেখার ভেতর নিয়ে আসার ক্ষমতা তার আছে। আর তাই দেখার বিষয়বস্তু সাবলীলভাবে বর্ণনা করতে করতে তিনি কাহিনি পরে নিয়ে এসে জোড়া দিতে পারতেন।

"জনাব নিকলবি টেবিলের ওপরে রাখা হিসাবের খাতাটি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি নোংরা জানালা পার হয়ে বাইরে আটকে গেল। লন্ডনের শহরতলির কিছু কিছু বাড়ির পেছনে বিষাদাচ্ছন্ন এক টুকরো জমি থাকে যেগুলো সাদা চুনকাম করা চার দেয়ালে ঘেরা। আশপাশের কালো চিমনিগুলো ঐ সব টুকরো জমির দিকে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এসব জমির ভেতর বছরের পর বছর ধরে বিকলাঙ্গ ভঙ্গিতে দুই একটা গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শরতের শেষে যখন অন্য সব গাছের পাতা ঝরে যায় তখন এইসব বিকলাঙ্গ গাছ গোটাকয়েক নতুন পাতার জন্ম দিয়ে বেঁচে থাকার প্রবল প্রচেষ্টা করে যায়। পরবর্তী মৌসুম না আসা পর্যন্ত এসব গাছ এমন জীর্ণ-শুষ্ক ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে থাকে। লন্ডনের মানুষ কখনো কখনো এইসব অন্ধকারাচ্ছন্ন জমির টুকরোকেই 'বাগান' নামে অভিহিত করে থাকে। এমন নয় যে এসব বাগানে কেউ গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা করে। বরং কখনো কেউ এসব জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করে না। পুরনো আমলে ওসব জায়গায় ইটের ভাটা ছিল। সেই জমিতে কিছু জীর্ণ আগাছা বড় হয়েই এসব বাগানের সৃষ্টি হয়েছে। এসব হতশ্রী জায়গায় বেড়ানো বা সময় কাটানোর কথা কেউ কখনো কল্পনাও করে না। গোটাকতক ঝুড়ি, আধা ডজন ভাঙা বোতল বা এ ধরনের আরও কিছু জঞ্জাল এসব টুকরো জমিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাগানের সাথে লাগোয়া বাড়িগুলোতে নতুন ভাড়াটে এলেও এসব জঞ্জালের কোনো রফা হয় না। তারা চলে যাবার পরও এসব জঞ্জাল যেমন ছিল তেমনই পড়ে থাকে। খড়ের ভেজা টুকরোগুলো অলস ভঙ্গিতে যতটা সময় প্রয়োজন ততটা সময় নিয়ে ক্ষয়ে যায়: ভাঙাচোরা বাক্সের সাথে মিশে ওগুলো চির বাদামি রূপ ধারণ করে, সেসবের পাশেই পড়ে থাকে ফুলের ভাঙা টব—আর এসব কিছুই শোক সন্তপ্ত ভঙ্গিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 'কালো' ও নোংরা আবর্জনার দখলে চলে যাবার অপেক্ষায় দিন গোনে।

ঠিক এমনই একটি জায়গার দিকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন র‍্যাল্ফ নিকলবি...তার দৃষ্টি মৃতপ্রায় বিকৃত আকৃতির একটি গাছের ওপর নিবদ্ধ। কয়েক বছর আগে ঐ বাড়িটার কোনো এক বাসিন্দা সবুজ রঙের টবে গাছটি

BanglaBook.org

লাগিয়েছিল। নিতান্ত অবহেলায় পড়ে থাকতে থাকতে টবটা রংহীন হয়ে গেছে আর সময়ের সাথে সাথে টবের গাছটা রুগ্ন মলিন আকার ধারণ করেছে.........গাছটা ছাড়িয়ে আরেকটু দূরে বাঁয়ের একটি ছোট্ট ধূসর জানালায় একজন করণিকের চেহারা আবছাভাবে দেখা গেল; ঐ এক মুহূর্তের সুযোগেই জনাব নিকলবি লোকটিকে তার সাথে দেখা করার ইঙ্গিত দিলেন।

ডিকেন্স প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন আর পাঠক হিসেবে আমরা তা উপভোগও করেছি। কারণ এইরকম বিশদ বর্ণনা, উপন্যাস পূর্ববর্তী সাহিত্যে দেওয়া হতো না। এটি একটি নতুন স্বাদের মতো যা লেখকের সাথে সাথে পাঠকেরাও মজা করে উপভোগ করেছে। এই একই স্বাদ কিন্তু বার বার ভালো লাগবে না অর্থাৎ এই একই পদ্ধতি পুনরায় ব্যবহার করে আশানুরূপ ফলাফল প্রত্যাশা করাটা বৃথা। এই ধরনের বর্ণনা বার বার ব্যবহার করলে এর মূল আকর্ষণটাই হারিয়ে যেতে বাধ্য আর তাই লেখালেখি সবসময় নতুন কৌশল কেন্দ্রিক হতে হবে। এ কারণে সব লেখকের মেধাই সবসময় নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কারে খরচ হয়ে আসছে। উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে, মাত্র বিশ বছর পর ১৮৫৯ সালে নিজেরই লেখা *আ টেইল অব টু সিটিস* এর মদের পিপার দৃশ্যটিতে ডিকেন্স যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখিয়েছেন তা তার লেখনীর অন্য একটি কৌশলে পরিণত হয়েছে। তার এই কৌশলটি চমকপ্রদ, কিন্তু অলঙ্কারবহুল বিশদ বর্ণনার গঠন প্রকৃতি অদ্ভুত ধরনের যা পাঠকের চোখের চাইতে মনে বেশি ছাপ ফেলে যায়!

"মদের একটি বড় পিপা আছড়ে পড়ে ভেঙে গেছে... দোকানের সামনের পাথুরে পথের ওপর বাদামের একটা খোসার মতো সেটা পড়ে আছে।

দোকানের আশেপাশে যারা কর্মব্যস্ত ছিল বা অলসভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, তারা সবাই মুহূর্তের মধ্যে বিনে পয়সায় মদ গেলার জন্য হুড়োহুড়ি করে ছুটে এল। দোকানের সামনের পথটা তৈরির সময় অমসৃণ পাথরগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে, দেখে মনে হয় রাস্তাটি বানানোর উদ্দেশ্যেই হলো পথচারীর পা ভেঙে খোঁড়া করে দেওয়া। এই মুহূর্তে ঐ এবড়োখেবড়ো পাথরের টুকরোগুলোই ছোট ছোট গর্তের ভেতর মদ আটকে রেখেছে। দেখতে দেখতে প্রতিটি গর্তের সামনেই মানুষের ছোট বড় জটলা বেধে গেল। তাদের কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে আজলা ভরে মদ উঠিয়ে গলায় ঢালছে। কেউ কেউ আবার তাদের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া মহিলাদের সাহায্য করছে, যাতে তারা মুঠো গলে মদ পড়ে যাবার আগেই গলায় ঢালতে পারে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে বাদবাকি

BanglaBook.org

সবাই মগ বা হাতের কাছে পাওয়া ছোট ভাঙাচোরা তোবড়ানো পাত্র গর্তে ডুবিয়ে মদ নিচ্ছে। এমনকি মায়েরা মাথার স্কার্ফ খুলে মদে ভিজিয়ে শিশুদের মুখে নিংড়ে দিচ্ছে, এমন ঘটনাও ঘটছে...

উপরের অংশটুকুতে ভাঙা বাদামের খোসা আর ভাঙাচোরা তোবড়ানো মগের বর্ণনায় তরুণ বয়সী ডিকেন্স যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরে ঘটনার বর্ণনা দিতেন, তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যসব বর্ণনা পাঠকের সামনে সত্তর বছর আগের বিপ্লবী প্যারিসের বর্ণনাচিত্র ফুটিয়ে তোলার চাইতে বরং রাজনৈতিক কার্টুনের প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

মূলত সকল শাখার আবিষ্কার মিলেমিশেই সাহিত্য গড়ে ওঠে। আর ব্যুৎপত্তিগতভাবেই সাহিত্য হয়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক এবং বিচক্ষণ। সাহিত্য পাঠককে আনন্দ দিতে পারে। আবার সাহিত্যের এক একটি শাখার উৎকর্ষতার নিজস্ব মৌসুমও থাকে যা সময়ভেদে দীর্ঘ বা হ্রস্ব হতে পারে। তবে সাহিত্যে যতই নতুন নতুন কাঠামো তৈরি হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত শুরুর কাঠামো উদ্ভাবকদের কাছেই আমাদের বার বার ফিরে যেতে হবে। চিরকালই সাহিত্যের শেষ কথা হলো ভালো মানের লেখা কখনো কখনো পরীক্ষামূলক কাঠামো ব্যবহার করে আশ্চর্যজনক ফলাফল পাওয়া যায়। *দ্য ইম্পরট্যান্স অব বিইং আরনেস্ট* অথবা *ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল* এর বেলায় এমনটিই ঘটেছে। তথাপি ভালো লেখা হলো সেটাই যার কাঠামো এবং উপাদান দুই-ই নতুন স্বাদের। ভালো কিছু সৃষ্টি করতে গেলে লেখার কাঠামো কেমন হওয়া উচিত তা লেখককে ভুলে যেতে হবে। কল্পনার ডানায় ভর করেই আমাদের নতুন আশাতীত কিছু তৈরি করতে হবে। এবং অবশ্যই লেখালেখির এইসব কলাকৌশল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শেখা অসম্ভব একটা ব্যাপার।

সকল চলমান শিল্পের মতোই সাহিত্য চির পরিবর্তনশীল। সাহিত্য তৈরির মূল কৌশলও সদা পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনের ধারা সাহিত্যের অপরিহার্য অংশ। শেকসপীয়ারের নাটক, মহাকাব্য, রেস্টোরেশন যুগের হাসির নাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ অথবা ইতিহাস ভিত্তিক সাহিত্য—এগুলোর কোনোটাই লেখকদের চিরকাল একই গতিতে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। মানুষের সৃষ্টিশীল মেধা যেমন সৃষ্টি করতে করতে ক্ষয় হয় তেমনি সাহিত্যের সকল শাখাই এগিয়ে যেতে যেতে একসময় সাধ্যের শেষ প্রান্তে পৌছে যায়। উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়

সাহিত্যের নতুন ধারা হিসেবে উপন্যাস উনিশ শতকের ইয়োরোপকে নতুন ধরনের বার্তা পৌছে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বার্তা পেতে পেতে পাঠকের মনে এই বিবমিষা সৃষ্টি হয় যে তারা সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে

banglabook.org

পড়েছে। ঐ সময়ের উপন্যাস রোমান সাম্রাজ্যকালীন সময়ের মতো পুনরায় উপজাতীয় বা আঞ্চলিক জাগরণের ধরায় ফিরে যাচ্ছিল। ফলে তখন ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তারপরও বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাই মনে হোক না কেন উপন্যাস এখনো উনিশ শতকের কাঠামো উদ্ভাবকদের লেখার ধারাকেই অনুকরণ করে চলেছে এখনো তা তার সেই উদ্ভাবক লেখকদের পুরনো স্বপ্নকেই রসদ যুগিয়ে চলেছে যা কিনা সামঞ্জস্যহীন নতুন বাস্তবতাকে বিকৃত করে ফেলতে পারে

কাঠামোগত দিক থেকে বিচার করলে উপন্যাস এখন বহুল পরিচিত একটি মাধ্যম। তবে উপন্যাস লেখার পদ্ধতি শেখানোর পরিসর খুব কম। উপন্যাস এখন বিভিন্ন মাত্রায় কখনো কাছ থেকে বা সরাসরি আবার কখনো দূর থেকে নার্সিসিজম বা আত্মপ্রেমের জন্ম দেয়। এই আত্মপ্রেম বাস্তবতার পরিপূরক হিসেবে উপন্যাসের কাঠামোকে এমনভাবে দাঁড় করায় যা জীবনের প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ভ্রান্তির জন্ম দেয়। জীবনকে এই রূপে তুলে ধরায়, বর্তমানের বাণিজ্য সর্বস্ব ভ্রান্ত পৃথিবীর একটি দাম্ভিক ধারণা হলো যে সাহিত্যের সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ হলো উপন্যাস।

এই পর্যায়ে এসে আমাকে আবার শুরুর কথায় ফিরে আসতে হচ্ছে। ঘটনাবহুল উনিশ শতকের সামান্য ঔপনিবেশিক পরিবর্তনের কারণেই হয়ত কোনো শিক্ষক বা বন্ধু দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমার বাবা ১৯২০ সালের শেষের দিকে লেখালেখি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেমনটা তাঁর ইচ্ছা ছিল তেমন না পারলেও কিছুটা লেখালেখি তিনি করতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখার হাত ভালোই ছিল তাঁর গল্পগুলো ভারতীয়দের এমন এক অতীতকে তুলে ধরেছে যা প্রায় বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল। জগতের ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে পাওয়া বাবার লেখক মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আমাদের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে আমাদের গোষ্ঠীর কাছে কোনো চলমান সাহিত্যের ঐতিহ্য ছিল না। আর তাই সেই সামাজিক পরিমণ্ডলের ভেতর বাবার কষ্টপ্রসূত গল্পগুলোর পাঠকের পরিমাণও ছিল হাতে গোনা

বাবা তাঁর নিজের ভেতরের লেখক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য একটি সময়ে বেড়ে ওঠার সুবাদে আমিও সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায় পরিপূর্ণ করতে পেরেছি কিন্তু এখনো আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে জটিল অর্থবহ বইগুলো পড়া আমার জন্য কতটা কঠিন ছিল। দুটি ভিন্ন জগতের অজানা অন্ধকার তখন আমার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার সমগ্র কল্পনার জগৎ ঘিরে ছিল চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রের সবকিছুই অবশ্য অন্য এক দূরের জগৎ থেকে আসা কিন্তু সেই কৌতূহল জাগানো জগতের সবকিছুতে সহজে প্রবেশ

BanglaBook.org

করা যেত। সেই জগৎটা সত্যিকার অর্থেই এক বৈশ্বিক শিল্পের সৃষ্টি করেছিল। এ কথা অবশ্যই অতিরঞ্জিত নয় যে ১৯৩০ আর ১৯৪০ এর দশকের হলিউডি চলচ্চিত্র ছাড়া আমার আধ্যাত্মিক মনোজগতের কোনো বিকাশই ঘটত না। আমার পড়া লেখার বা লেখক হয়ে ওঠার কাহিনি বলতে গেলে চলচ্চিত্রের এই অবদানটুকু অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে বিংশ শতকে এসে কাল্পনিক সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনের ক্ষমতা বা মেধাটুকু উপন্যাস থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চলচ্চিত্রে স্থান করে নিয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের চলচ্চিত্রের স্বর্ণালি যুগ আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org